BANGLA KOUNTERKULTURE
ARCHIVE MAGAZINE

ODDJOINT

002 / MAY 2015

কভার ফটো: কিউ

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

জৈষ্ঠ ১৪২২ ● মে ২০১৫

১. আন্ডারগ্রাউন্ড চেতনা

আই ওয়েই ওয়েই

সমাজপত্তনের কিছুদিনের মধ্যেই আন্ডারগ্রাউন্ডেরও জন্ম। স্বাভাবিক নিয়মেই সমাজে নীতিগত পার্থক্য দেখা দেয়। মানুষ তার অধিকার কায়েম করতে তৈরি করে বিকল্প সংগঠন। বৈষম্য মানুষকে প্রতিবাদ জানাতে বাধ্য করে বারবার। এবং কোনও প্রতিষ্ঠানই সেটা ভালোভাবে মেনে নিতে পারে না। বিকল্প চেতনাকে নির্মূল করতে ক্ষমতার সম্পূর্ণ ব্যবহার করে তারাও। অগত্যা প্রতিবাদকারীদের গা ঢাকা দিতে হয়। পাতাল বেশ অন্ধকার একটি জায়গা। লুকিয়ে থাকার পক্ষে আদর্শ। কথায় বলে দেবতারা অমৃত ঝেড়ে দিয়ে অমরত্ব প্রাপ্তি করেই কালো হুমদো অসুরগুলোকে ব্যাপক তাড়া দিলেন। অসুররা প্রতারিত হয়ে ভেঙে পড়েছিলেন। বুদ্ধিমান অসুরেরা এটাও নিশ্চিত বুঝতে পারলেন যে ক্ষমতার মূলে কয়েকটি দুষ্কর্ম থাকতে বাধ্য। এই অমোঘ সত্যটি উন্মোচিত হওয়াতে তেনারা আর কোনও কথা না বলে গা ঢাকা দিলেন পাতালে। অমর এবং সুকান্তি দেবতারা ওই অন্ধকারে কারুর টিকি দেখতে পেলেন না। এরপর দেখ গেছে যে প্রায়ই অসুরেরা গেরিলা অ্যাটাক চালিয়ে গেছেন স্বর্গে, এবং বিব্রত করেছেন আমোদরত দেবতাদের। তাতে আর কিছু না হলেও দেবতাদের সারাক্ষণ একটা চাপ খেয়ে যেতে হয়েছে।

যে কোনও র‍্যাডিকাল চিন্তাধারা একটা না একটা সময়ে বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। ব্যাপারটা অত্যন্ত রাজনৈতিক। ‘আন্ডারগ্রাউন্ড’ কথাটা তারই আরেক নাম। অর্থাৎ বলা যেতে পারে প্রত্যেকটি গুরুত্বপূর্ণ আন্ডার গ্রাউন্ড আন্দোলনের মূলে ছিল কিছু বিধর্মী, রাজনৈতিক চিন্তা। আন্ডারগ্রাউন্ডের মানে এই নয় যে, তার আইডিওলজি সীমাবদ্ধ থাকবে। বিকল্প চেতনা জনসাধারণকে উপেক্ষা করার জন্য

জাফর পনাহি

নয়। প্রাতিষ্ঠানিক বেড়াজাল টপকে সেই চেতনার নির্যাস মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়াই বিকল্পধর্মীর টার্গেট। কিন্তু সেটা প্রত্যেকবার বেড়াজাল ডিঙিয়ে, অন্ধকারে নিঃশধে না করলে ক্ষমতার বলিষ্ঠ আঘাত অনিবার্য।

'গাভু'-র মতো একটা সিনেমা চিনের মতো দেশে দেখানো অসম্ভব। পৃথিবীর অন্যতম টোটালিটারিয়ান দেশে সরকারের অনুমতি ছাড়া প্রায় কোনও কিছুই করা যায় না। মুষড়ে পড়ার কিছু নেই, ভারতবর্ষ এই লিস্টের প্রথম সারিতেই জাজ্বল্যমান। ফ্রিডম অব এক্সপ্রেশন এই দুই মহান দেশেই প্রায় নিষিদ্ধ, যদিও গণতন্ত্র নামের অদ্ভুত জানোয়ারটিকে দুই দেশেই চরতে দেখা গেছে। যাক গে, চিনের কথা হচ্ছিল। ওখানে অবস্থা বেশ সঙ্গীন। সাঙ্ঘাতিক কোঁদাকুঁদি। অথচ হঠাৎ জানতে পারলাম যে চিনাতে একটা নয়, দুটো নয়, পাঁচটা শহরে 'গাভু' দেখানো হবে! আন্ডারগ্রাউন্ড স্ক্রিনিং। প্রত্যেকটা শো হাউসফুল। দেখতে এসেছেন স্টুডেন্ট, ডাক্তার, পোস্টম্যান, মুদি, লাইব্রেরির কর্মকর্তারা। সিনেমা শেষে গুরুগম্ভীর প্রশ্ন। বোঝা গেল সাধারণ মানুষ সামাজিক নিয়ন্ত্রণের বাইরে ভাবতে ইচ্ছুক। বিপণনের এই জগৎটা নিয়ে তারা উদ্বিগ্ন। প্রত্যেক শহরে মডারেটর হিসেবে রয়েছেন ওখানকার অন্যতম আন্ডারগ্রাউন্ড আর্টিস্টরা। তাদের মধ্যেই একজন ঝেং ঝেন (Zheng Zhen)। সাংহাইয়ের 'মডার্ন বাদল সরকার' বলা যেতে পারে। অসামান্য ভাগ্য আমার, পরের দিন রাতেই ওনার একটি ব্র্যান্ড নাটকের পারফরম্যান্স। দেখতে গেলাম। নাটক নয়, একটি টাটকা বোমা! শোষিত চিনের ন্যাংটো ছবি। নির্লজ্জভাবে মেলে ধরলেন নাট্যপরিচালক ও তাঁর কুশলীরা। স্তব্ধ হয়ে দেখলেন প্রায় সাতশো যুবক-যুবতী। কারোরই বয়স তিরিশের বেশি নয়। অনুষ্ঠানের শেষে টুপি পেতে কুশলীরা দাঁড়িয়ে রইলেন, যে যা পারলেন টুপিতে নামিয়ে রাখলেন সম্ভ্রম ভরে।

এই চিনেরই কুখ্যাত আন্ডারগ্রাউন্ড শিল্পী আই ওয়েই ওয়েই। একাধারে স্কাল্পচার, পেইন্টার, এথনোগ্রাফার, আর্কিটেক্ট, মিউজিশিয়ান, ফিল্মমেকার, এক্সপ্রেশনিস্ট, পারফরম্যান্স আর্টিস্ট। কী করেননি উনি? প্রাতিষ্ঠানিক যুক্তিকে অক্লান্ত আক্রমণ করে গেছেন। তাঁকে বন্দি করে রাখতে বাধ্য হয়েছে চিনের সরকার। সারা পৃথিবী আন্দোলন করেছে তাঁর মুক্তির জন্য। জেল থেকে ছাড়া পেয়ে আই ওয়েই ওয়েই আবার আরেক বিধ্বংসী কাজ করে প্রবল সঙ্কটে ফেলে দিয়েছেন তাঁর দেশের ক্ষমতাশীল মানুষদের।

অ্যারেস্ট করা হয়েছিল জাফর পনাহিকেও। আমার পরিচিত অন্যতম অনুপ্রেরণার উৎস, কাতায়ুন শাহাবিও অ্যারেস্ট হয়েছিলেন। অ্যারেস্ট হয়েছিলেন ইরানের আরও বেশ কিছু ফিল্মমেকার এবং আর্টিস্টরাও। ইরানের সরকার তবুও এদের মুখ বন্ধ করতে পারেননি। 'দিস ইজ নট আ ফিল্ম' নামে সিনেমাটি জাফর পনাহি বানান বন্দিদশায়। এবং সেই ফিল্মটি তিনি বাইরে পাচার করতে সক্ষম হন। স্বৈরাচারী সরকারের বিরুদ্ধে শিল্পীর লড়াই গত কুড়ি বছরে এক বিরাট আকার ধারণ করেছে। যার একটি বিশেষ কারণ, ডিজিট্যাল প্রযুক্তি।

ইন্টারনেটের অন্ধকারে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে বেশ কিছু বিধ্বংসী আইডিয়া। যে কোনও খবর আজ বিনা পয়সায় লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সম্ভব। বহু চেষ্টা করেও এখানে কোনও বেড়াজাল টানতে পারেনি ক্ষমতাময় রাজনীতি। সব আগুনের দেওয়াল টপকে ঢুকে পড়েছে অসামাজিক চিন্তাধারা। না, শুধু পর্ন নয়। অল্টারনেটিভ ইকো সিস্টেম গড়ে উঠেছে বিভিন্ন শিল্পচেতনার। বোমার মতো ছুড়ে দিয়েছে ইনফরমেশন। প্রযুক্তি সাধারণ যুবক-যুবতীকে করে তুলেছে ফিল্মমেকার। সারা পৃথিবীর মিউজিক আর ফিল্ম হঠাৎ এসে পড়েছে ডেস্কটপে। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমার সমস্ত পড়াশোনা। এখানে খুঁজে পেয়েছি নিষিদ্ধ শিল্পীদের, যাঁদের কাজ আমাকে হতবাক এবং অনুপ্রাণিত করেছে। যাঁদের শিল্পীসত্তা বিভিন্নভাবে আন্ডারগ্রাউন্ড কাণ্ডকারখানা চালিয়ে গেছেন, শত বিপদ সত্ত্বেও। এই নিষিদ্ধ পৃথিবীতে দেখা হল আমার সিনেমার সঙ্গে। দেখা মাত্র প্রেম।

সিনেমা শিল্প আর বাণিজ্যের এক মহামিলন। কিন্তু সিনেমার বিপুল জনপ্রিয়তা তাকে ছোটো করে বাণিজ্যের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। স্টুডিও সিস্টেমের বিরুদ্ধে ক্যামেরা তুলে দাঁড়িয়েছেন সাতের দশক থেকে মহান চিত্র পরিচালকেরা। ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভের জন্ম এই ধনতান্ত্রিক সিনেমাকে চ্যালেঞ্জ জানাতেই। সেখান থেকে তৈরি আধুনিক সিনেমার গ্রামার। তারপর চল্লিশ বছর কেটে গেছে এবং আমেরিকান সিনেমা দুর্যোগের মতো সারা পৃথিবীর আকাশ ঢেকে ফেলেছে। এমন সময়

নব্বই দশকের মাঝামাঝি হঠাৎ মাথা চারা দেয় আরেক আন্ডারগ্রাউন্ড মুভমেন্ট। ডেনমার্কের চার স্টুডেন্ট বন্ধু শুরু করেন এক ফিল্ম অ্যাক্টিভিজম Dogme ৯৫। তার মধ্যমণি লার্স ভন ত্রিয়ের। তাঁরা বললেন, সিনেমা ল্যাঙ্গুয়েজ বন্দি হয়ে আছে হলিউড স্টুডিওর গুমঘরে। সমস্ত পুরোনো নিয়ম অগ্রাহ্য করে তাঁরা বানালেন নতুন ধারার ছায়াছবি। ফিল্মে নয়, ডিজিটাল মাধ্যমে। তাতে ক্লাসিক সিনেমাটিক এসথেটিকস্ গেল মায়ের ভোগে, কিন্তু তৈরি হল এক নতুন ভাষা। এক নতুন আদর্শের।

লার্স ভন ত্রিয়ের

তাহলে কি সত্যি এটা হতে পারে? সিনেমা কি সত্যি বাণিজ্যের ঘেরাটোপ থেকে বেরিয়ে আদর্শ গণতান্ত্রিক হতে পারবে। তাহলে কি আমিও . . .? আন্ডারগ্রাউন্ড ফিল্মমেকার ভারতবর্ষে নেই তা নয়। তবে তারা মূলত তথ্যচিত্র বানান। গত ১৫ বছর ধরে আধুনিক ভারতবর্ষের অল্টারনেটিভ হিস্ট্রি তাঁরা ম্যাপ করেছেন। নিঃশব্দে। সত্তরের দশকে বিপ্লবের প্রেক্ষাপটে বেশ কিছু সিনেমা হয়েছিল, তবে কোনও কারণে তখনও আমাদের দেশে সোশাল ক্রিটিকের একটা আনুষ্ঠানিক দাম ছিল। সোশালিস্ট ডেমোক্র্যাসির নির্দেশ অনুযায়ী ক্রিটিকাল আর্ট রাষ্ট্রীয় অনুদানপ্রাপ্ত। সুতরাং সেই সময় অনেক সিনেমাই কেন্দ্রীয় সরকারের অনুদানে প্রযোজিত হত। সে সময় চলে গিয়েছে। আজকের সত্যি হল উন্মুক্ত বাজার। যেখানে সব কিছু পণ্য। সব কিছু প্যাকেজিং।

খাভান ডি লা ক্রুজ

আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমার নিদর্শন পাওয়া যায় পৃথিবীর সমস্ত দেশে। এমনকী আফ্রিকাতেও। ফিলিপিনসের বস্তির মধ্যে থেকে বেরিয়ে আসেন খাভান ডি লা ক্রুজের মতো ভয়ঙ্কর ডিরেক্টর। ক্যামেরা যার অস্ত্র বই আর কিছু নয়। মনে পড়ে হারমোনি করিনের কথা। মার্কিন সাব কালচারকে অসামান্য দক্ষতায় ক্যামেরাবন্দি করেছেন করিনে। একের পর এক জঞ্জালের কবিতা পর্দায় এঁকে গেছেন। ল্যারি ক্লার্ক যিনি চাইলেই হলিউডে নাম কামাতে পারতেন কিন্তু চাননি। ওদিকে ড্যানি বয়েল, যাঁর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি আরভিন ওয়ালসের নাটক অবলম্বনে ‘Trainspotting’, তিনি কব্জি ডুবিয়ে খেলেন কমার্শিয়াল মার্কেটের ক্ষীর। ‘স্লামডগ’ করে।

আরভিন ওয়ালস কিন্তু কাজ চালিয়ে গেছেন এবং যাচ্ছেন। ব্রিটেনের ঘুপচি গলির তেতো আস্বাদ তাঁর লেখায় এখনও ক্ষুরধার। অন্ধকারে জগতের স্থায়ী বাসিন্দা তিনি। আমার জীবনে আরভিন ওয়ালস হচ্ছেন নবারুণ ভট্টাচার্য। আরেক পাগল, আরেক বিপ্লবী, আরেক অনন্য আন্ডারগ্রাউন্ড শিল্পী তাকাসি মিকে জাপানি সিনেমার মোড় ঘুরিয়ে দিলেন অক্লান্ত চেষ্টায়। তাঁরও প্রথম ঠিকানা পাতাল দেশ।

আরও কত নাম। মাইক ফিগিস্, অশোকা হান্ডাগামা, গদার, কোসাকোভস্কি, ভার্জিনিয়ে ডেসপেন্তেস কোরালি, ত্রিন থি, ব্রুস লা ব্রুস, কেনেথ অ্যাঙ্গার। শুধু উন্মুক্ত শিল্প চেতনার ঢেউ। তাঁদের কাজ প্রমাণ করে দেয় সিনেমার ভাষাকে আটকালে চলবে না। তাকে ভাঙা-গড়ার দায়িত্ব শিল্পীর। সেই টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে নতুন কিছুর জন্ম হবে বারবার। ■

২. ধু ধু প্রান্তরে বনে কেবলই তুষার ঝরছে সুরজিৎ সেন

‘আমি অঙ্ক কষতে পারি ম্যাজিক
লুকিয়ে চক ও ডাস্টার
কেননা ভারি ধুন্ধুমার ট্রাম্পেটবাদক ব্যান্ডমাস্টার
তখন প্রোগ্রাম হয়নি শুরু
সারাহ টেম্পল নাম্নী ক্যাবারিনা
এমনি বসে ডায়াসের কোণে
আমি ড্রামে কাঠি দেওয়ামাত্র ওর শরীর ওঠে দুলে
ড্রিরি-ড্রাঁও স্ট্রোকেতে দেখি বন্যা জাগে চুলে’।

এই শুরু হল তুষার রায়ের ‘ব্যান্ডমাস্টার’ কবিতা। তুষার ছিলেন বাংলা কবিতার কাউন্টারকালচারের এক স্বপ্নপুরুষ। ৩৬ বছর আগে সেপ্টেম্বরের এমনিই এক রবিবারের সকালে ৪২ বছরের তুষারের স্বপ্নভঙ্গ হয়।

বাংলাদেশের নড়াইলে জমিদার পরিবারে তুষারের জন্ম। শুরুর দিকে কয়েক বছর বাদ দিলে তুষারের জীবন কেটেছে কলকাতার বরাহনগরে। সেখানেই প্রপিতামহের নামে রাস্তার (রতন রায় রোড) উপর তাঁদের বিরাট অট্টালিকা। তুষারদের পারিবারিক শ্মশানটিও প্রপিতামহের নামে। অবস্থার ফেরে সেই অট্টালিকা ছিন্নভিন্ন করে ভাড়া দেওয়া টাকাতেই সংসার চলে, কারণ ওই পরিবারের কেউ কোনও দিন চাকরি করেনি। অতীতের গৌরব ভাঙিয়ে চলা অবক্ষয়ের মধ্যেই তুষারের বড়ো হওয়া। জন্মগত হাঁপানি ছিল, যৌবনের শুরুতে কেউ পরামর্শ দিয়েছিল তুষারকে, আফিম খেলে রোগটা আর বাড়বে না। ধরলেন আফিম। আর তাঁকে ধরল মদ, গাঁজা, চরস, নেশার ট্যাবলেট।

স্কুলের শেষ ক্লাসে পড়াশোনায় ছেদ। শিল্পী হবেন বলে ঢুকলেন ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজে। টাকার অভাবে কেনা হল না ক্যানভাস আর রং। তাই তুলির বদলে কলম। লিখে কিছু টাকা পেতেন, কিন্তু তাতে নেশার খরচও উঠত না। সামান্য টাকায় দোকানের সাইনবোর্ডও এঁকেছেন। তুষারের চেহারা ছিল সুন্দর, ফর্সা, সুগঠিত, খর্বকায়। পরনে ফুল হাতা শার্ট গলা থেকে হাতা পর্যন্ত বোতাম লাগানো আর ইংলিশ ট্রাউজার, পায়ে শু। পোশাক দারিদ্রে ম্লান, কিন্তু তুষার অম্লান। প্রেমে পড়লেন এক গুজরাতি তরুণীর। সেই প্রেম ব্যর্থ। পরে অনিতা, পূর্ণিমা ও কুমকুম, এই তিন মহিলার সঙ্গে তুষারের গভীর প্রেম হয়। অন্তত তুষার তাই বিশ্বাস করতেন। প্রথম জন চিত্রশিল্পী আর পরের দু’জন কবি।

ছবি: সমীরণ দাস

তুষার রায়

ভিলাইতে কী একটা চাকরি নিয়ে গেলেন, কিছু দিনের মধ্যেই ফিরে এসে বললেন, ‘কবির উপযুক্ত চাকরির জন্ম হয়নি এখনও পৃথিবীতে’। ডুবে গেলেন নেশা, কবিতা, গদ্য আর স্বরচিত স্বপ্নজগতে। ৩৩ বছরে শরীরে হঠাৎ ভিটামিন কমে গিয়ে গ্লকুমা রোগে চোখের মণি বেরিয়ে আসে, বন্ধু ডাক্তারদের চেষ্টায় বিপদ সামলানো

গেলেও সম্পূর্ণ সুস্থ হননি। ৩৪ বছরে বন্ধুরা তাঁর প্রথম কবিতার বই ‘ব্যান্ডমাস্টার’ ছাপে, কোনও বিজ্ঞাপন ও প্রচার ছাড়াই মাস চারেকের ভেতর ৪৮ পাতার বইটির ৫০০ কপি বিক্রি হয়। সোশ্যাল ড্রপআউট তুষারের কবিখ্যাতি জোটে। যাঁরা তুষারকে কবিতা পড়তে দেখেছেন, তাঁরা বলেছেন কবিতা আর শরীরের ভাষা মিলিয়ে সে এক অনবদ্য পারফরমেন্স। তাঁর বন্ধু মৌলিনাথ লিখেছেন,
মুক্তমেলায় তুষার কবিতা শুরু করলেন,

‘সাত সতেরো হেঁকোড়বাজি
ছেচল্লিশটা ছোকরা পাজি
হেঁকে বললে, ‘দুনিয়াতে ভাই কে কার’ . . .

এই পর্যন্ত বলে তুষারের টিকা, ‘হেঁকোড়বাজি কথাটা লক্ষ করবেন অসাধারণ ব্যাপার আছে শব্দটার মধ্যে, ভাবা যায় না’ বলে আবার ফিরে গেলেন কবিতায়,

‘তোমার মেয়ে বন্ধু তোমার একার
একের পরেই বসবে শূন্য
পয়েন্ট, পাপের এবং পুণ্য
আমার জন্য আসছে ডবলডেকার।’

তুমুল হাততালিতে তুষারকে ঘিরে ধরে যুবক যুবতীর দল। তাঁর একটি ছড়া লোকের মুখে মুখে ফিরত,

‘বিপ্লব যবে শুরু হয়েছিল
তুমি ছিলে পুরোভাগে
ধরপাকড়ের মহেন্দ্রক্ষণে তুমিই ভেগেছ আগে
এর ওর ঘাড়ে ঘুরেছ পাহাড়ে
বসেছ নিত্য নব দাঁড়ে দাঁড়ে
তুমি কাকার সঙ্গে কাকাতুয়া
ফের শুয়োরের সাথে দাঁতাল
সাড়ে আটটায় খালাসিটোলায় মাতালের পাশে মাতাল।’

নেশাচ্ছন্ন তুষারকে প্রায়ই দেখা যেত ট্রাফিক সিগন্যালে ছুটন্ত ট্রাক-বাস-মোটরের ঝাঁকের ভেতর দিয়ে দৌড়ে মৃত্যুকে ধোঁকা দিয়ে রাস্তার অন্যপারে যেতে। এ ছিল তাঁর প্রিয় ডেথ-ডেথ খেলা। প্রিয় নেশার ট্যাবলেট ছিল ডরিডন। কিন্তু বেঁচে যাবেন এই বিশ্বাসে, বন্ধুর সঙ্গে বাজি রেখে একবার এত ম্যানড্রেক্স খেয়েছিলেন যে, হাসপাতালে স্টম্যাক পাম্প করে তাঁকে বাঁচানো হয়, বাজি ছিল পাঁচ টাকার। তুষারের আর একটি নেশার বস্তু ছিল ‘ফট্’। তুষারের ভাষায়, ‘সে এক দিব্য বটিকা। খ াবার পর মাথার মধ্যে ফট্ করে আওয়াজ হয়। একটা ঠাণ্ডা ভারি স্রোত শরীরের উপর থেকে নীচে পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। পৃথিবীর সমস্ত বন্ধ দরজা একসঙ্গে খুলে যায়। অসীম আনন্দের দেশে প্রবেশ করা যায়, যেখানে অপমান, উঁচুনীচু, দর কষাকষি নেই। একসময় শোনা যাবে ফট্। মানে আমি ‘আনফট্ হয়ে গেলাম। এবার শান্তভাবে বাড়ি ফিরে যাওয়া।’
বড়ো এক বোতল কফ্ সিরাপ পানের অভিজ্ঞতায় তুষার, ‘সে এক অদ্ভুত নেশা। সারা শরীরে যেন ডেভ ব্রুবেক জ্যাজ বাজাচ্ছে।’
নিজেকে ভাবতেন শহরে শ্রেষ্ঠ ইনটিরিয়র ডেকরেটর। বলতেন, কলকাতার বড়ো হোটেলগুলোর ভেতর সব তাঁরই সাজানো, তাই ওই সব হোটেল থেকে মাঝে মাঝেই লাঞ্চ/ডিনারের নিমন্ত্রণ আসে। বাস্তবে হয়তো দুদিন খাওয়াই জোটেনি। টাকা ধার করতেন, শোধ না দিয়ে অপমানিত হতেন আবার ধার করতেন। তুষার একমাত্র বাঙালি কবি যিনি তাঁর সমাধির এপিটাফ এবং তাঁকে দাহ করাকালীন যে কবিতা পড়া হবে দুই-ই লিখেছিলেন।
এপিটাফের শুরু,

'সেই কবি শুয়ে আছে এইখানে
তিনটি বুলেট বুকে নিয়ে শুয়ে, আছে এইখানে
সেই কবি মিছিলের পুরোভাগে ছিল
তিনটি বুলেট তাকে শুইয়ে রাখেনি, জেনো।'

আর শ্মশান বন্ধুদের জন্য লেখা কবিতার শুরু,

'বিদায় বন্ধুগণ, গনগনে আঁচের মধ্যে
শুয়ে এই শিখার রুমাল নাড়া নিভে গেলে
ছাই ঘেঁটে দেখে নেবেন পাপ ছিল কি না।'

তাঁর মৃত্যুর পর ছাপা দীর্ঘ কবিতার শেষটা,

'বাহাদুর কফির পেয়ালা হাতে, আর ডিং ডং
ঘণ্টার শধ শুধু ভেসে আসছে তিব্বতী গোম্ফার
ব্যাস আর কেউ নয়, কিছু নয় শুধুই তুষার, শুধু
ধূ ধূ প্রান্তরে বলে কেবলই তুষার ঝরছে, শুধুই তুষার।'

দিনের পর দিন অর্ধাহার আর নেশায় ডুবে থাকার ফলে ৩৬ বছরের যক্ষাক্রান্ত তুষারকে যেতে হল মেদিনীপুরের স্যানিটোরিয়ামে। সুস্থ হয়ে এলেও, মৃত্যু তখন তাঁর শীর্ণ শরীরে ছায়া ফেলেছে। যিনি বলতেন, 'আমার গলায় চারহাজার কবিতা পোষা তোতার মতো বাসা বেঁধে আছে', সেই তুষার তুমুল ভিড়ের কবি সম্মেলনে একটা কবিতাও মনে করতে পারছেন না। শেষ পর্যন্ত নড়াইলের জমিদারের ছেলেকে দাতব্য 'বনহুগলি সমাজ সেবা'য় যেতে হল। সিরোসিস অফ লিভার। এক শরতের ভোরে রক্ত বমি করতে করতে মারা গেলেন 'ব্যান্ডমাস্টার'। আগের রাতে লেখা কবিতাটি তাঁর বালিশের পাশে পাওয়া গিয়েছিল, সেটির শেষ পাঁচ লাইন,

'একদা একসঙ্গে কল্পনার সোমরস পান করেছিলাম
আজ বড়ো একা লাগে—সারাক্ষণ লোডশেডিং
কিছুই করার নেই তেমন—এমন সময় কে যেন ডাকে
চৌকাঠ টপকে রেলিঙে ঝুঁকে দেখি
চাঁদের আলোয় তুষার পুড়তে থাকে।'

এইসময় রবিবারোয়ারি, ৮ সেপ্টেম্বর, ২০১৩

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

জৈষ্ঠ ১৪২২ ● মে ২০১৫

তুষার রায়

কালো মলাটে ঢাকা যে কবিতাগুলি তুষার আমাকে দিয়েছিলেন সেই কবিতাগুলিই এখানে আছে। বানান ও যতিচিহ্ন যা ছিল তাই মোটামুটি রক্ষিত হল। কোনো কবিতায়ই কোনো রকম তারিখ, সময় ও স্থানের উল্লেখ নেই। মোট কবিতার সংখ্যা একশ ছয় ছোট বড় মিলিয়ে। কিছু কবিতায় শিরোনাম ছিল না।

—অজয় নাগ

অপ্রকাশিত তুষার (১৯৮৮)

ছবি: সম্বরণ দাস

আমরা

অস্পষ্ট ধোঁয়ার মতো নাকি স্পষ্ট মেঘময়
পাহাড়ের ভাঁজে কোনো নিষিদ্ধ নগরী
সূর্যের কিরণে যা অদৃশ্য, অথচ ফোটে
ফুটে ওঠে জ্যোৎস্নার নম্র সম্প্রপাতে

কার হাতে চাবি আছে, এ শহর জেগে উঠবে
কার পদপাতে?

জাল পাসপোর্ট নিয়ে আমরা আসিনি
সন্ত্রাস কামান ঘোড়া আমাদের নয়
আমরা তো নক্ষত্রের বাতি দেখে এখানে এলাম
প্রভুর সংবাদ নিয়ে এই বেথেলহেমে।

অসম্ভব

আমি তোমাদেরই লোক বলে
অতঃপর ফিরে আসা অসম্ভব
কেননা বুকের মধ্যে আমি আরো বুক ক্ষীণ কটি
জবরদস্ত পাছার মতন রেখ সাংগীতিক
সাংঘাতিক ফলানো ফসল ফেলে ছুটে গেছি জেব্রা দৌড়
জীব্রাল্টার প্রণালীর অন্য কোনো নালী বেয়ে
সেই পিয়ালী নদীর গাঢ় গভীর তরল রব শুনে তাই
পুনর্বার ফিরে আসা অসম্ভব।

অতঃপর ফেরা ফের অসম্ভব
জনপ্রিয় কবি হয়ে তোমাদের হাতে বিকি কিনি
চালাবার পাল্লামাপা চাল আলু চিনি
ওসব আমার নয়—রক্তলাল ভীষণ মুলেটা হাতে
ম্যাটাডর সেভিলির এরিনায়
ডাক দেয় মৃত্যু ষাঁড়
ও আমায় আমি ওর, পরস্পরের গভীরেতে খেলা সব
তাই পুনর্বার ফিরে আসা অসম্ভব।

অধুনা বিপ্লব চাই

অনুপ্রবেশকারী নাগাদের পারা
অকস্মাৎ শিল্পী বলে ঢুকে এল তারা
আশী লাখ টাকা দিয়ে বড় ক্যানভাসে দ্যাখো
তুলল সঙ্গম।

এ্যাকাদেমী, আর্টিস্ট হাউজে তুমি প্রদর্শনী বিল গোনো
আড্ডা মারা, মাছি মেরে ভরে তোল স্থাবর জঙ্গম।
ওদিকেতে ততক্ষণে ভীড়ে ভীড় কী হাউজ ফুল!
ওহো হো হো এ টাকায়—
আশী লক্ষ এ টাকায় বেঁচে যেত ভ্যানগগ,
গোগাঁ আর মাইকেল, মানিক
আরো কত সৃষ্টি মেধা, সত্যেনের বিজ্ঞান খানিক।

বুড়ো-বুড়ি ছেলে, বৌ, নাতি নিয়ে সঙ্গমে ছুটছে
(চূড়ামণি যোগে ত্রিবেণী সঙ্গমে আর ভীড় হবে না!)
তবে আর কেন, লব্ধ প্রাজ্ঞ হে ক্রিটিক, তুমিও দৌড়ও
অন্ধকার প্রেক্ষা পানে বৈজয়ন্তী তুলে।

সুতরাং আমাদের বাদ-প্রতিবাদ পরে হবে, অধুনা বিপ্লব চাই।

এখন কবিতা

এখন শরীরের প্রত্যেকটি কূপ কিংবা ক্ষতমুখ থেকে
নির্গলিত এ্যাসিড জ্বালানো বাদামী ধোঁয়া
এখন দূর বনে কুড়ুল চালানোর শব্দে আমার রক্তপাত
চারপাশের মুখ ও প্রকৃতির মধ্যে দ্রুত বিবর্তন, মানে
যার যা হবার কথা সে তার বিপরীত হয়ে যাচ্ছে
যেমন ঘোড়া হয়ে যাচ্ছে রমণীর প্রকৃষ্ট প্রেমিক, আর

হীরের মতো দাম পাচ্ছে তেলাকুচোর মালা।

বমি করার শব্দের মতো হয়ে এসেছে গান প্রায়
মস্তিষ্কের জায়গায় পেট আর লিঙ্গের ওপর চোখ
বহু বদলোক এখন ভেজালের মতো তরলে তরল
কঠিনে কঠিন মিশে থাকছে
তাই দুধ কি মদের মধ্যে জলের হিসেব ধরা
এখন সত্যিই খুব কঠিন হে।

এ সব কথায়

একবার আমি রাগলে জেনো
আকাশখানাই ছিঁড়ে দেব
তাহলে ভাই তুমি কি আর বসতে দেবে আমায় পিঁড়ে দেবে
ভরা কলসী গড়িয়ে গেলে তলাতে তার বিঁড়ে দেবে?

আমি এখন ভাঙার খেলা খেলতে খেলতে
ভাঙা হারাই
ভাবতে পারো—তবু আমি পুরনো সেই ঘড়ি সারাই,
করাতগুলো চিবিয়ে এবং চেটে খাওয়ার ইচ্ছে নিয়ে
কেইবা আমায় এই বয়সে করবে কিংবা দিচ্ছে বিয়ে

কেই বা বলবে আসুন মশায় বসতে তোমায় পিঁড়ে দেব

এসব ক্ষোভে—রাগলে জেনো আকাশখানাই ছিঁড়ে দেব।

পাশে থাকি

এই দেহের প্রতিটা শিরা টিসু
তোমাদের জন্যে
তোমরা বিশ্বাস করলে না
আমি ভক্ত হনুমান
তোমরা বুঝলে না

তোমাদের হুকুমের অপেক্ষায় অনুক্ষণ
সারাদিন কেটে যায়

রাতের তারারা ডাকে আয়
তবু তোমাদের পাশে পাশে থাকি
সাজিয়ে রাখি ভাঙাচোরা মন প্রাণ ধন।

জ্যামিতিক অজুহাত

বিপ্রতীপ কোণ থেকে বিদ্রূপ
ষড়ভুজ কেন্দ্র থেকে বেড়ে ওঠে প্রেমের চারাটা
ত্রিভুজের সঙ্গমে সেই সে ধারাটা
খুঁজতে খুঁজতে খাঁজের মধ্যে চুপ

বালির ওপর বল পড়লো ধুপ
লম্ব উলম্ব বেয়ে লম্ফমান ছায়া
নেমে গেলে উদোম এবং উদ্দাম, নেই হায়া
দুই সমবাহুর মধ্যে এঁটে দি কুলুপ।

ড্র্যাপারি

সমস্ত ট্রেন, প্লেন আমাদের দৌড়, অগ্রগমন গতি
আমাদের খেলকুদ শিল্পমিথ আমাদের শুচিস্মিত বোধ
সব পূজা ভোগ আভোগ ও কানাড়ায়
দীপ্র ধীরোদাত্ত হে প্রাণ পরকলাতে চোখের
রেটিনা যেন ওয়েল্ডিং ফ্ল্যাশ দ্যাখে . . . তারপর
শা ন্ত বক ভেসে যায় ডানা
ভেসে এসে যেখানেতে স্থির সব রেলপথ
সেইখানে, সেইখানে চন্দ্রালোকে শা ন্ত ওড়ার মতো
ব্রিজ ভেসে আছে—

স্টিল লাইফ

আমাদের ওয়ার্ডোব, মণিকার শিথিল সে 'ব্রা'

বালির চরায় ভিজে পড়ে আছে আমাদের কনডম্

মদের বোতল থোকা আঙুরে আপেলে

আমাদের বন্দুকও পড়ে আছে ধর্মগ্রন্থ গীতা সব

সেইখানে, সেইখানে
আবছায়া শা-ন্ত সুদূরের ব্রিজ ছায়া ফেলে। ■

তুষার রায়ের ১০৬ টি কবিতাই এখানে প্রকাশিত হবে।

ছবি: সম্বরণ দাস

৪. অরুনেশ ঘোষ সুচেতা ঘোষাল

অরুনেশ ঘোষ

অ্যাসিড দিয়ে পোড়ানো মেয়েদের মুখগুলো মন দিয়ে দেখেছেন কখনও? অথবা ওয়াশিকুর রহমান নামের যে ব্লগার ঢাকায় মৌলবাদীদের হাতে খুন হলেন গতমাসে? ওই প্রায় থেঁতলে যাওয়া মুখটার দিক থেকে চোখ সরিয়ে ঠিক কতক্ষণের মধ্যে পেজ থ্রির বলিষ্ঠ পুরুষের উপর চোখ রেখে স্বস্তি পেয়েছেন? রেলে কাটা পরা প্রেমিকের দেহাবশেষ দেখতে গিয়েছিলেন কি মর্গে? নানাবিধ ছাল ছাড়ানোর পরে, মানুষের চেহারার কী অদ্ভুত বদল ঘটে লক্ষ্য করে দেখেছেন? তাদের ছায়াগুলো কিন্তু তখনো অবিকল,আগের মতোই থাকে, অথচ রক্ত মাংসের মূর্তিগুলো হয়ে ওঠে একইসাথে অসহায় আর শক্তিশালী। অরুণেশ ঘোষের কবিতা, প্রবন্ধ ও যাবতীয় রচনা সম্পূর্ণ নগ্ন। উপরোক্ত ঘটনাগুলোর মতোই অস্বস্তিকর, ভয়হীন এবং সৎ।

আমার ব্যক্তিগত অসাবধানী ও অস্থির সময়-যাপনের একটা বৈশিষ্ট্য হল, জীবনের বিভিন্ন ধাপে যেসব কবি ও তাদের কবিতা আমাকে অশান্তি দিয়েছে, তাদের কাছে আমাদের অশেষ কৃতজ্ঞতা। সন তারিখ খেয়াল নেই, কোনও এক ঘন দুপুরে কেউ একজন কানের কাছে উচ্চারণ করেছিল, ‘‘আমি মাথা নীচু করে প্রণাম করেছিলাম বেশ্যাকে। বেশ্যা তো থ। সে এক কাব্য, জানো ভারি একটা গল্প হয়ে গেল তারপর।’’ তারপর আরও বলে চলল, ‘‘সে আমাকে দিল তার নৃত্যরত ছবি, যোনিমুদ্রা আঁকা কালো গান, স্তনহীন নারীকে অপসারিত করার অধিকার এবং সে-কারণে ছুরি। সে আমাকে শেখাল দুঃখের গণিত, আমি মূর্খদের কিনতে শিখলাম। ঊরুর মাংস কাগজে মুড়ে হাতে তুলে

দিল সে, 'গাঁ গঞ্জে বিতরণ কোরো, সবাইকে বোলো এই মাংসের কথা।' বেশ্যাকে আমি প্রণাম করেছিলাম অন্ধকারে। নারীকে ক্রুশবিদ্ধ করলে ক্রুশকাঠ কি অপমানিত বোধ করে?" দুপুরবেলার নিশ্চিন্ত মধ্যবিত্ত জীবনকে এইসব প্রশ্ন করলে, ভারি ঝামেলা নেমে আসে। আমার আবার তাতে খুব আরাম, স্বস্তির দিনগুলোই বরং অসহনীয় হয়ে ওঠে বেশিরভাগ সময়ে।

কবিরা স্বভাবগতভাবে অত্যাচারী হন, ফটোগ্রাফার অথবা চিত্রকরেরা কিন্তু তুলনায় নিরীহ। কবিদের খেলা তো শব্দ নিয়ে, আর শব্দের ইন্টেন্সিটি আলো অথবা রঙের থেকে অনেক পরিমাণে বেশি হিংস্র, শব্দে রহস্যের জন্য পড়ে থাকে অল্পই। আর আমরা যারা পাঠক, শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে সেই ফাঁদে পা'ও দিয়ে চলেছি, স্বেচ্ছায়, একের পর এক কবিকে সুযোগ দিয়েছি প্রলয় বাঁধানোর। প্রলয় তা ঠিক কোথায় দেখা যাক—যুগযুগান্তরের কাব্যে, রচনায়, আলাপে যে মায়ায় ঢাকা থাকতো যৌনতা, অরুণেশের কবিতা একটানে খুলে দিয়েছে সেই মায়া আবরণ। একটা কবিতায় যখন ধর্ষিত হয় চাষীর ঘরের কিশোরী মেয়ে, অন্য কবিতায় মধ্যবিত্তের ঘরে ধর্ষণ করে মাইনে করা গৃহশিক্ষক। সমাজ তৈরি করা অনেক শ্রেণিগুলোর একটা থেকে অন্যটায় ঝাঁপ দিতে দিতে অরুণেশ বুঝিয়ে দিতে থাকেন—কি নিম্ন কি মধ্য—অন্ধকারে পার্থক্যগুলো চেনা যায় না আর, তখন সব মানুষকেই উলঙ্গ দেখায়। এমনকী ব্যাসদেবও তো দুর্বল জীবনের নিষ্ঠুরের কাছে।

> নিজেকে নিক্ষেপ করো কুরুক্ষেত্রে তোমাকে চেনে না কেউ,
> তুমিও তন্মধ্যে বোকা বোকা মুখ নিয়ে,
> খুঁজবে কী অর্থ গীতার শ্লোকের পাশে ব্যাসের ব্যাসার্ধ
> অর্থাৎ সঙ্গমরত ব্যাসদেব নিজে জানে কি
> জন্মান্ধ আর জন্ডিস জন্মাবে, হায় তার ব্যর্থ বীজে!

অরুণেশ ঘোষের নানা সময়ের সাক্ষাৎকার থেকে খুব সহজেই জানা যায় তাঁর জীবনযাত্রার কথা, যা আমাদের চেনা ছকের থেকে আলাদা। সমাজের যেখানটায় আলো অল্প, যেখানে সমাজ-চিহ্নিত অন্যায়কে রাস্তা ধরেই মানুষ বেআব্রু হয়েছে, কিন্তু প্রকৃতির কাছে, নিজেদের কাছে তারা স্বচ্ছ, অরুণেশ চিরকাল সেখানে স্বস্তি পেয়েছেন। বেশ্যাপল্লীর অনেকের সাথে একসাথে তাঁর বড়ো হয়ে ওঠা। একসাথে কয়েকজন তকমাহীন মানুষ যেমন দিনযাপন করেন, সেইভাবেই। তাঁর সমস্ত লেখা জুড়ে এঁদের রাজত্ব—যে বেশ্যার উপার্জনে বৃদ্ধ বাপের দিন কাটে, অথবা কচি ছেলের পড়াশোনার খরচ চলে, তিনিই নায়িকা। উন্মাদ স্বামীকে উঠোনে রেখে, স্ত্রী ঘরে ঢোকে অন্য এক পুরুষকে নিয়ে, সঙ্গম শেষে দুই পুরুষের সামনে সাবান মেখে চান করতে করতে স্বাভাবিক আলাপ চালায় তার সঙ্গীটির সাথে। স্বামীর সামনেই, হাসতে হাসতে জানায় অনেক চেষ্টা সত্বেও তার উন্মাদ স্বামীটি গায়ে কোনও কাপড় রাখতে চায় না। ''সব সময় ল্যাংটা, কি বিশ্রী, এর জন্য কেউ-ই—কোনও লোকই আসতে চায় না"—নগ্নতাকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এই কবিতায় প্রশ্ন থেকে যায়, কে তবে নগ্ন হলো? সে বাড়ির পাগল? তার স্ত্রী? নাকি তার সঙ্গী? এই ডায়নামিক্সগুলোই অরুণেশের কবিতা। অরুণেশ অন্ধকারের কবি, সকল অর্থেই অন্ধকারের মানুষ। প্রতিদিনের খবরের কাগজে অ্যাসিড পোড়া মেয়েগুলোর মুখ, একের পর এক লেখক যাঁরা শুধু তাঁদের মতো করে সত্যিটুকু বলার অপরাধে কুপিয়ে খুন হচ্ছেন প্রতিমাসে, তাঁদের শরীরগুলো দেখলে মনে হয় অমন একজন মানুষের খুব দরকার হয়ে পড়ছে এই দিনকালে।

তবে কবিরা সহজে মরেন না, দেহ হারান ঠিকই। অরুণেশের শরীর যেমন ছেড়ে যায় পুকুরের জলে, হার্ট অ্যাটাক ঘটে জলে থাকাকালীন। কিন্তু অরুণেশ যে ভীষণ কবি, আর কবিরা সহজে মরেন না। পাঠকের প্রেম, অপ্রেম, যৌনতা, আবেগে, আশ্লেষে, পাঠকের রাজনীতি জুড়ে তারা বাঁচেন। বেঁচে থাকবেন। ■

৫. কবিতা অরুনেশ ঘোষ

মাকে

জয়পুর থেকে আমার চিঠি যায়
তুমি ডাকপিয়নের কাছ থেকে হাত বাড়িয়ে নিয়েছ সেই চিঠি
আমি ভাবতে পারি, তোমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে
তুমি পড়তে পারো না, ছানি ফেটে বেরিয়ে আসতে চায় তোমার চোখ
তোমার যুবা বয়সের সেই চকচকে চোখের মণি
তুমি চিঠি পড়তে পারো না, মা আমার
তোমার সাদা ছানি ক্রমে রক্তিম . . . ক্রমে নীলাভ হয়ে যায়
সেই হিজিবিজি আঁকা একখণ্ড কাগজ হাতে নিয়ে তুমি বসে থাকো
তুমি বসে থাকো সারা দুপুর, দুপুর থেকে গড়িয়ে গড়িয়ে
সন্ধ্যাবেলার দিকে যাও
আমি দেখতে পাই, লাইটপোস্টের তলায় তুমি বসে আছ
ভিখিরির মতো তোমার পোশাক ভিখিরির মতো তোমার চুল
আধা-অন্ধ দু-চোখ তুলে তুমি তাকাও

মেয়েদের হল্লা গলির ভেতর থেকে ভেসে আসে, তুমি শুনতে পাও
শুনতে পাও মাতালদের হা হা হাসি, তুমি বসে থাকো
আমার হাত ধরে সেই ছেলেবেলায় যেখানটায় এসেছিলে
সেখানেই থেকে গেলে চিরটা দিন
আমি তো কত দেশ ঘুরে বেড়ালাম কত সরাইখানায়
আকণ্ঠ মদ্যপানের পর আমার স্বপ্নহীন ঘুম
শেষ হয় গেল
এক সরাইখানা থেকে আরেক সরাই হেঁটে যাবর পথে
আমার সঙ্গে আলাপ হল বেশ্যাদের
ক্লান্ত ঘুমে জড়ানো তাদের চোখ, চোখ কচলে হাই তুলে
শায়া ও ব্লাউজ পরা মেয়েরা বেরিয়ে এল আমার গলা শুনে
আমাকে ছুঁয়ে দেখল, ওদের উরুসন্ধিতে দুই বুকের মধ্যিখানে
মুখ ডুবিয়ে আমি আমার অজান্তে খুঁজে বেড়ালাম
খুঁজে বেড়ালাম ছেলেবেলা
মা আমার, চিঠি শুঁকে দ্যাখো তুমি—সেই গন্ধ
সেই পুরনো গন্ধ—যা তোমারই, তোমার গর্ভের
চোলাইয়ের গ্লাসে আমার সাদাটে ঠোঁট নড়ে ওঠে
চোখ ও চশমাসুদ্ধ আমার মুখের ছায়া
নাথুয়া শালবাড়ির নেপালি মেয়েদের হো হো হাসির মধ্যে

আমার ধূসর হয়ে আসে আর আমার চুল

মা
আমাদের কোনো দুঃখ নেই আর, কোনো শোক
দুজনেই মরে পড়ে থাকব, দুজনেই
দুই দেশের দু-রকম রাস্তার পাশে
একইরকম ভাবে

পুড়ে যাচ্ছে মাতৃসদন

যশোমতী, যিনি উঁচু পেট নিয়ে কাল দুপুরে এখানে এসেছেন, তিনি আজ ভোরবেলা দয়াপরবশে খাঁচ খুলে মাতৃসদনের সবুজ টিয়া ছেড়ে দিয়েছিলেন। যশোমতী কুমারী, সবুজ টিয়া সেগুন জঙ্গলের দিকে উড়ে গিয়ে এই দুপুরবেলায় আবার ফিরে এসেছে, ঠোঁটে বয়ে নিয়ে এসেছে আগুন।

মাতৃসদন পুড়ছে, লাল টিনের বাড়ি আরও লাল, হিস হিস করছে হাওয়া, পুড়ে যাচ্ছে সেবিকাদের পোশাক, টুপি ও চুল। দুধের জন্য গাভীরা সারিবদ্ধভাবে পুড়ে যাচ্ছে, তাদের কাঁকালে আগুন, পিতৃপরিচয়হীন শিশুরা সমবেত হয়েছিল রান্নাঘরের ধোঁয়ার মধ্যে, ডান হাতে থালা বাঁ-হাতে মগ, তারা এখন জ্বলন্ত, তাদের আঙুল জ্বলছে লকলক করে, কিশোরীদের অস্ফুট স্তনবৃন্তে আগুন পুড়ে যাচ্ছে গোল হয়ে, রূপসি ঝাড়ুদারনি ঝাঁটা তুলে ধরেছে আকাশের দিকে, আগুন খেয়ে ফেলছে তার কোমর, নিতম্ব ও জানুমূল, সহসা সেই নীচু রমণীর মনে হল রাত ও শীর, পোশাক বাইরে খুলে রেখে হেঁট হয়ে সৈনিকের তাঁবুতে ঢোকবার সময়ের শিহরণ, সেবিকাপ্রধান মহামায়াদি তার মোটা ও কুৎসিত হাতটা বাড়িয়ে দিলেন আগুনের দিকে। দমকল এসে পৌঁছয় না, মুখ থুবড়ে পড়ে যায় টেলিগ্রাফের সমগ্র খুঁটি, নষ্ট হয়ে যায় অসংখ্য তার, মানুষ দূরে কোথাও পকেট থেকে রুমাল বের করে নাক মোছে, এখানে আগুন, যশোমতী হাসছেন, তার গর্ভের শিশুও পুড়ে যাচ্ছিল আগুনে, ভেতরটা পুড়ে খাক্ হয়ে যাচ্ছিল, যোনিদ্বার দিয়ে বেরিয়ে এল অগ্নিশিখা, ঠোঁট পুড়ে গেল, স্তন ও চোখের মণিদুটো, কোটরে আগুন, ঘাড় গুঁজে টিয়াও পুড়ছিল।

এ বাড়ির পাগল

আরও একবার একই জায়গায় ফিরে আসতে হয়
সেইখানে, যেখানে বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে
এ বাড়ির পাগল, দেখেই কলকল করে হেসে উঠবে
তার বউ, এ্যাদ্দিন পরে মনে পড়ল বন্ধুকে, কী যে
মানুষ আপনরা . . .

এই সেই পাগল, যে দরোজার দিকে মুখ ফেরায় না
যখন আমরা ঘরে ঢুকে যাই একজনের পেছনে আরেকজন
দরোজা বন্ধ করে চাপা হাসিতে গড়িয়ে পড়ে বিছানায়
একের পর এক খুলে ফেলতে থাকে ওপর ও নীচের অন্তর্বাস
পাশ ফেরে ও চিত হয় . . . হাতের তালুতে মাথা রেখে
ঘাড় বাঁকিয়ে তাকায় আমার দিকে
যখন আন্ডারওয়ার পরা আমি বসে থাকি পাগলের
পরিত্যক্ত চেয়ারে

তখনও, বারান্দায় খুঁটির গায়ে হেলান দিয়ে
সে শুধুই খুঁটতে থাকে নখ

সাবানের বাক্স হাতে তারই পাশ দিয়ে চলে যায় তার বউ
সে তাকায় না, আমি বসে পড়ি পাগলের পাশেই
সে মুখ ঘুরিয়ে নেয় দক্ষিণ থেকে উত্তরে

. . . আরও একবার একই জায়গায় ফিরে আসতে হয়
সেইখানে, যেখানে বারান্দার খুঁটির সঙ্গে বাঁধা রয়েছে
এ বাড়ির পাগল
দূরে শালবন ও সাঁকো
পাগলকে ছেড়ে দিয়ে তুমি-ই বাঁধা থাকো?
হঠাৎ কি বলে উঠবে বউ . . .

কলতলায় সারা গায়ে সাবান মাখতে মাখতে সে হাসে
দ্যাখেন তো ত্যানা-ন্যাকড়া কিছু একটা পরাতে পারেন কিনা বন্ধুকে
সব সময় ল্যাংটা, কী বিশ্রী, এর জন্য বাড়িতে
কেউ-ই—কোনো লোকই আসতে চায় না . . .

নবদ্বীপ

আমাকে বলো তুমি ভাটিখানার বেওয়ারিশ কুকুর
নবদ্বীপ এখান থেকে কতটা দূর—কতটা দূর
যদি তোমার সঙ্গে হেঁটে যায় এই ছয়টি পা?
যদি তোমার সঙ্গে হেঁটে হেঁটে . . .
রাত্রিবেলার সেই ভুতুড়ে ট্রেন বা রান্নাঘর
গুঁড়িয়ে দিয়ে যায় দুঃখীবুড়ির
মশলা মাখা হলুদ হাতে আমায় দেখতে দেয় না সে
বেগুনখেতের মধ্যে জমে-ওঠা অন্ধকার আর নদীর রেখা
আর আলো-জ্বালা শহরগুলোতে চুপচাপ মানুষ
আমি তোমার সঙ্গে হেঁটে যেতে চাই

এই নাও এক পাত্তর দিশি—গলায় ঢেলে নাও
আর চিবিয়ে নাও এই কয়েক টুকরো হাড়
চলো আমরা বেরিয়ে পড়ি এই বৃষ্টি আর বাতাসের রাত্রিতে
এই জলে আর কাদায় এই মেয়ে বিদ্যুতে আর জ্যোৎস্নায়
চলো বেরিয়ে পড়ি
ভাটিখানা থেকে ভাটিখানা—মাঝরাত্রির ভাটিখানা
আর ভোররাতের, সন্ধ্যাবেলার আর দুপুরবেলার ভাটিখানা

হবে আমাদের ইস্টিশান—আমরা জল নেব এঞ্জিনে
থামবে আমাদের ছয়চাকার ছটফটে ট্রেন
থামাব উজ্জ্বল শহরে
মাতালদের হল্লায়, বমনরত বালকের পাশে
বিড়ি ধরানো আধবয়সি মেয়েমানুষের গা ঘেঁষে
আমরা থামাব আমাদের ট্রেন
তুমি ঘুমিয়ে থাকবে আমার ঘুমের কাছে
আমি ঘুমিয়ে থাকব তোমার ঘুমের কাছে
তুমি স্বপ্ন দেখবে আমার স্বপ্নের কাছে
আমি স্বপ্ন দেখব তোমার স্বপ্নের কাছে
এরকমভাবেই একদিন নবদ্বীপের ভাটিখানায়
পৌঁছে যাবে আমাদের কু-ঝিকঝিক গাড়ি,
ভাটিখানা
যার সামনাসামনি থানা
আর হরেকৃষ্ণ হরেরাম আর করতাল
আর কুঁচকে যাওয়া ঈশ্বরের লালচে লিঙ্গ
তোমার মনে আছে মাইরি, আমরা কতদিন হু হু
হু হু শীতের রাতে কুঁচকে যাওয়া ওই জিনিসটাকে
ভেবেছি আত্মা

তোমাকে নিয়ে যাব লোকবসতির মধ্যে
চিনিয়ে দেব বন্ধুর বাড়ি যাওয়ার বিদঘুটে গলি
জনাদার দোকান

চলো বেরিয়ে পড়ি—এই বৃষ্টি আর বাতাসের রাত্রিতে
এই জলে আর কাদায় এই মেঘে বিদ্যুতে আর জ্যোৎস্নায়
চলো বেরিয়ে পড়ি। ■

৬. নগ্নতার বোঝাপড়া তমোঘ্ন হালদার

বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যান্ড্রু মার্টিনেজ

আমরা মানে হোমো স্যাপিয়েন প্রজাতি, বর্ডার বা জেন্ডার, উঁচু বা নীচু, সাদা বা কালো নির্বিশেষে, সক্কলে মিলে একই প্ল্যাটফর্মে দাঁড়াই মোট দু'বার। মৃত্যুতে—মৃত্যুঞ্জয়কেও মরতে হয়। আর, জন্মকালীন নগ্নতায়। জীবন-ম্যারাথন-প্রারম্ভে আমাদের কারোর গায়ে কুটোটি থাকে না। পরবর্তী কোনো এক ল্যাপে, আমরা বুঝি, চলন ও গমনের উদ্দেশ্যে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান ও বংশবিস্তার। মজার ব্যাপার, একমাত্র মানুষ ছাড়া এই গ্রহের তেরো লক্ষ সাতষট্টি হাজার পাঁচশো চুয়ান্ন প্রজাতির প্রাণীরা, প্রত্যেকেই রাস্তাঘাটে বা স্ব-স্ব-স্থানে নগ্ন। তাহলে আমরা হঠাৎ জামাকাপড় পরছি কেন? এ প্রশ্ন গরমকালে জাগা স্বাভাবিক, উত্তরটাও পাওয়া যায় শীতকালে। কিন্তু পারদের ওঠ-বোস কি একমাত্র কারণ? ভেবে দেখলে, ডারউইনবাদের দরুণ, শীতকালে কুকুরের যেমন এক্সট্রা লোমবৃদ্ধি ঘটে, আমাদেরও তো হতে পারত—যদি না বস্ত্রধারণকে আমরা অভ্যাসে পরিণত করতাম? অতএব কারণ হিসেবে রইল পড়ে দুই—আপেল এবং কনভেনশন। আপেলটা ব্যাখ্যাতীত। আর কনভেনশন, অর্থাৎ ছোট্ট থেকে যেহেতু চারপাশের সকলকে জামাকাপড় পরতে দেখেছি, তাই বাই ডিফল্ট ধরে নিয়েছি, সভ্যতার অন্যতম শর্ত—বস্ত্র পরিধান। তবে কিনা, সবাই এমনটা নন। যেমন Andrew Martinez। ১৯৯২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, University of California, Barkley-র তৎকালীন

দ্বিতীয় বর্ষের এই ছাত্র হঠাৎ একদিন কিচ্ছুটি না পরে ক্লাসে হাজির! কেন?! না, তাঁর মনে হয়েছে যে জামাকাপড় না পরে তিনি নিজেকে নিজের মতো করে প্রকাশ করতে পারবেন। প্রচলিত মূল্যবোধের ছাঁচে ঢেলে নিজেকে সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলার কোনো দায় তাঁর নেই। আরো বিস্ফোরক, তিনি মনে করেন, যখন তিনি জামাকাপড় পরছেন, তখন নিজ-বিবেকের কাছে ছোটো হয়ে যাচ্ছেন, কারণ জামাকাপড় নাকি শ্রেণি ও লিঙ্গ বৈষম্যের এক সূক্ষ্ম হাতিয়ার। প্রাথমিকভাবে খোরাক মনে হলেও একটু ভেবে দেখলে, সত্যিই তো! আমার সাথে আপনার যখন প্রথম দেখা হবে, ঠিক যে যে Parameter দিয়ে মেপে নেব দুজন দুজনকে, তার মধ্যে একটা কি অবশ্যই জামাকাপড় নয়? (অন্ততঃ অধিকাংশ 'আপনার-আমার' ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। আমরা মেয়েদের চরিত্র এমনকি মানুষের 'Sexual Orientation' পর্যন্ত আঁচ করি জামাকাপড়ে চোখ বুলিয়ে। যাকে আমরা বলছি লজ্জানিবারক, সৌরতাপহারক, তা আদতে একধরনের বৈষম্যসৃষ্টিকারী উপাদানও বটে! নেত্রপাতমাত্র আমরা বুঝে যাচ্ছি কে কর্পোরেট, কে কলম-পেষা, কে সরস্বতী, কে মেরিলিন মনরো ইত্যাদি। সাম্যবাদী পাঠক লক্ষ করুন, 'Declassification'-এর গোড়ার কথা, মনের মধ্যে তৈরি হওয়া শ্রেণিচেতনাকে ভেঙে বেরিয়ে আসা। সেখানে পোশাক এমন এক 'Tool' যা উলটে শ্রেণিচেতনার জন্ম দিচ্ছে—আলাদা করে দিচ্ছে ইউ.এম.এম ধারী ও গ্র্যান্ড হোটেলের ফুটপাথের ক্রেতাকে। জটিল ব্যাপার বইকি! ফিরে আসি মার্টিনেজে। এই তরুণ বারবার গ্রেফতার হলেও প্রায় সবক্ষেত্রেই নির্দোষ প্রমাণিত হতেন। কারণ তিনি মাতলামি বা কাউকে জ্বালাতন করেননি, কোনো মানুষকে মারেননি, কোনো মেয়েকে বিরক্ত করেননি। স্রেফ নিজমনে, নগ্ন হয়ে লেকের ধারে জগিং করতেন আর সময়মতো পিঠে ব্যাগ ঝুলিয়ে ক্লাসে হাজির হতেন। মার্টিনেজের এইসব কাণ্ডের পরেই ক্যাম্পাসে নোটিস জারি করে নগ্ন হয়ে চলাফেরাকে নিষিদ্ধ করা হয় ও কিছুকাল পরে শহরে নগ্নতা সংক্রান্ত ordinance জারি করে মার্টিনেজকে জেলে পাঠানো হয়। অথচ প্রশাসন কিন্তু মার্টিনেজকে পাগল, সন্ত্রাসবাদী বা চোর-ডাকাত-ধর্ষক কিচ্ছুটি প্রমাণ করতে পারেনি। তবে কী এমন ঘটল যে তাঁকে জেলে পাঠানোটা রাষ্ট্রের কাছে জরুরি হয়ে উঠল? তাঁর মতাদর্শ ক্রমে ছড়িয়ে পড়ছে—এই ভয়ে?

আসলে, রাষ্ট্রের বা সমাজের কাছে সবচেয়ে ভীতিপ্রদ—প্রচলিত সংস্কারকে প্রশ্ন করা, প্রশাসন, বিরোধী, বুদ্ধিজীবী সবাই সবাইকে, যতক্ষণ পর্যন্ত 'রিং'-এর ভেতর দাঁড়িয়ে ঘুষি বাগাচ্ছেন, কোনো সমস্যা নেই। সমস্যা তখন, যখন কেউ রিং-এর প্রয়োজনীয়তা
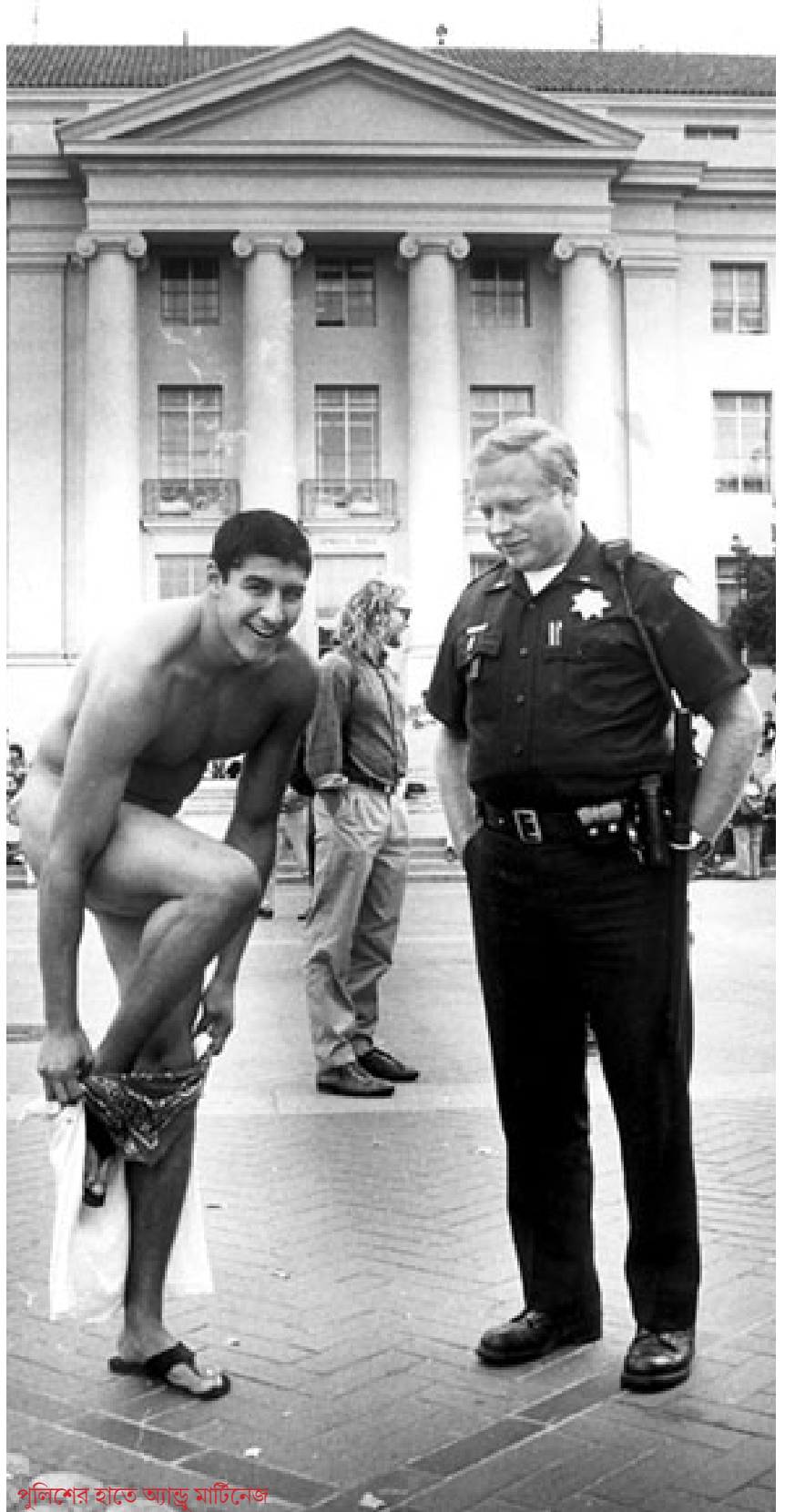
পুলিশের হাতে অ্যান্ড্রু মার্টিনেজ

বা সামগ্রিকভাবে 'বক্সিং'-এর প্রক্রিয়াটা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। সেটা হয়ে যায় ব্যক্তিস্বাধীনতার সাথে রাষ্ট্রের লড়াই। এমনিতে কিন্তু মানবাধিকার মানে অন্য মানুষের সরাসরি অসুবিধে না ঘটিয়ে যা খুশি তাই করার অধিকার। 'সরাসরি অসুবিধে', অর্থাৎ আমার বক্তব্য, দাবি, আমি আমার পছন্দের উপায়ে প্রকাশ করতে পারি, কিন্তু অন্যের প্রাণের বা গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ (অর্থ, সময় ইত্যাদি)-এর বিনিময়ে নয়। আবার ভোর চারটেয় ফুল ভলিউমে মেটালিকা শোনার অধিকারও আমার আছে, যদি না তা ব্যাঘাত ঘটায় রুমমেটের বা প্রতিবেশীর ঘুমের (আবারও, ঘুম তার ভালো থাকার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া, তাই)। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে রাষ্ট্র এসবের চেয়েও অনেক বেশি চিন্তিত প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিকে আঘাত করা নিয়ে। তাই সে নিজের মতো করে গড়ে পিটে নিয়েছে 'অসুবিধে'র সংজ্ঞা। নগ্ন দেবদেবীর পেন্টিং তার অসুবিধের কারণ হয়ে দাঁড়ায় (খাজুরাহো বা মাইকেল এঞ্জেলোর ডেভিড নিয়ে কিন্তু সমস্যা হয় না)। অবশ্য সেসব তো শিল্প-সেন্সর-এর ব্যাপার। তার মধ্যে কাজ করে অতি সূক্ষ্ম রাজনৈতিক চক্রান্ত। প্রকাশ্য রাজপথে নগ্নতার ব্যাপারে সমস্ত রাষ্ট্রের কিন্তু অবস্থান একই। প্রতিবাদই হোক বা স্বেচ্ছায়, কেউ যদি রাস্তায় নামেন বিবস্ত্র হয়ে, রাষ্ট্রের ইগোতে আঘাত লাগেই। যদিও ভারতবর্ষে পস্কোবিরোধী আন্দোলনে বা সেনাবাহিনীর অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যে বীরাঙ্গনারা নগ্ন হয়ে রাস্তায় নেমেছিলেন, তাদের বিরুদ্ধে আদালতকে লেলিয়ে দেওয়া হয়নি। আবার নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারী-পুরুষ ও Transgender-রা যখন Sltuwalk বা গে-প্যারেডে অংশ নেয়, রাষ্ট্র বিরক্ত হয় ঠিকই, কিন্তু ততটাও কঠোর হয় না যতটা মার্টিনেজ-এর ক্ষেত্রে হয়। কারণ এইসব ক্ষেত্রে নগ্নতাকে বিদ্রুপ-এর ফর্ম হিসেবে দেখা হয়। অর্থাৎ তা দিনশেষে কষ্টসাপেক্ষ হলেও প্রেডিক্টেবল। গোল বাঁধে যখন কেউ ''সবাই পরছে তাই আমাকেও জামাকাপড় পরতে হবে''-র বিরোধিতা করে অর্থাৎ শুরুতেই চলতি ছককে অস্বীকার করে এগোতে চায়। তখন সমাজ বা রাষ্ট্র অস্বস্তি, অসুবিধের দোহাই দেয়। অথচ সে যুক্তি কিন্তু ধোঁপে টেঁকে না। আমার দেহ আমি কতটা ঢাকব বা আদৌ ঢাকব কিনা তা একান্তই আমার ব্যাপার। আমার যদি নিজ-নগ্নতাকে প্রকাশ্যে আনতে লজ্জা বা অস্বস্তি না হয়, তাহলে অন্যের হাজার অস্বস্তি হলেও আমার পিছনে আইনকে লেলিয়ে দেওয়া যাবে না। হঠাৎ কোনো নগ্ন জগারকে দেখে ছোটো ছেলেটি বা মেয়েটি যদি বাবাকে প্রশ্ন করে, ''বাবা ও জামা পড়েনি কেন?'', তার উত্তরে বাবা বলতে পারেন, ''ওর ইচ্ছা তাই''। এটা নয়, ''ছিঃ ছিঃ। ওর দিকে দেখো না মামণি, ও পাগল।'' অস্বস্তি হতেই পারে, কারণ ছোটো থেকে যা দেখার অভ্যেস নেই, তা হঠাৎ দেখলে 'কেমন একটা লাগে' বইকী! কারণ তা প্রচলিত সভ্যতার ইমেজকে আঘাত করে।

যেমন করেন Stephen Gough। সমাজকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে লন্ডনের রাজপথে হেঁটেছেন, জেলে গেছেন, আদালতেও নগ্ন হয়েছেন—পুরোটাই প্রায় রুটিন হয়ে গেছে এখন। অবশ্য এহেন অসমসাহসীকে নিয়েও বিতর্ক আছে। ২০০৪-এর Daily Telegraph-এর পাতায় লাখ টাকার ডিজাইনার পোশাকে আবির্ভূত হয়েছেন। যিনি পোশাকের ধারণাকেই প্রশ্ন করছেন, তাঁর এমত আচরণ দৃষ্টিকটু, অন্ততঃ কিছুটা তো বটেই। অবশ্য 'Publicity Stunt'-এর এই বিতর্ক এক্কেবারে খাটে না মিশরের আলিয়া মাগদা এলামহদিকে নিয়ে। ভয়াবহ রক্ষণশীল মিশরে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর ব্লগে পোস্ট করেছেন নিজের নগ্ন ছবি। ধর্মীয় রক্ষণশীলতা, লিঙ্গবৈষম্য, যৌন হেনস্থার বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবাদ। শুধু আইন নয়, তাঁর পিছনে তাড়া করেছে খুনি, কিডন্যাপার ও ধর্ষকেরা। এখন সুইডেনে আশ্রয়ের খোঁজে আলিয়া। তাঁর পাশে ইজরায়েলি তরুণীরা, কিন্তু দেশীয় সহযোদ্ধারা? প্রেস বিবৃতি দিয়ে ত্যাজ্য করেছেন তাঁকে। এখানেও, অধিকাংশের দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধকে আঘাত করায় রাষ্ট্রের খাঁড়া নেমে আসে ব্যক্তির অধিকারে।

প্রতিষ্ঠিত বেদী ও চালু মূল্যবোধকে প্রশ্ন করা নিয়ে এত কথা যখন উঠছেই, তখন একবার রিওয়াইন্ড-এ যেতেই হয়—ষাটের দশকের আশেপাশে। প্রকাশ্যে নগ্ন হওয়ার অধিকার নিয়ে ইতি-উতি আন্দোলন আগেও ঘটেছে। ১৯৩৪-এ নিউ ইয়র্ক, বা অন্যত্র। D.H. Lawrence-ও ততদিনে স্বীকৃতি পেয়েছেন। কিন্তু সামগ্রিকভাবে যে কোনো সংস্কারকে প্রশ্ন করা, রাষ্ট্রের চোখে চোখ রাখা শেখায় ষাটের দুনিয়া। সে এক অদ্ভুত সময়। সাঁর্ত্রর দর্শন, গিন্সবার্গের কবিতা, বিট প্রজন্ম, হিপি আন্দোলন, ফেলিনির সাড়ে-আট, গোদারের জাম্পকাট, বাগম্যানের Virgin Spring, লেনন ওনোর বেড ইন, টু ভার্জিনস অ্যালবামের প্রচ্ছদ, প্যারিসের ছাত্র আন্দোলন, ভিয়েতনামে মার্কিন আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে আন্দোলনরত ছাত্রকে কেন্ট স্টেটে গুলি করা, জিমি হেনড্রিক্স, জিম মরিসন . . . অগুনতি আপাত-বিচ্ছিন্ন উপাদান মিলে মিশে অস্বীকার করে পেশী শক্তিকে। যুক্তিবাদ ও তারুণ্যের স্পর্ধা রাষ্ট্রের উঁচানো বেয়নটের সামনে ফুল বাড়িয়ে দেয়। এমনকী যৌনতা ও নগ্নতা নিয়ে সামাজিক দৃষ্টিকোণকে সমূলে উৎপাটিত করতে চেয়েছিল সেই সময়। যার ফলস্বরূপ সমকামীদেরও মানুষ গণ্য করা হয় অনেক দেশে। প্রকাশ্যে নগ্নতা নিয়ে সমস্ত নামী বিশ্ববিদ্যালয়ের দৃষ্টিভঙ্গির বদল ঘটে। ৬০-এর দশক না এলে, কে বলতে পারে, পুরো পৃথিবীটা আবু ঘ্রাইব হয়ে যেত না? হ্যাঁ, এখনও অনেকটাই বদলায়নি, তবু 'The Freedom To Be Yourself'-এর মতো সংস্থারা চেষ্টা চালাচ্ছে, লড়াই জারি রেখেছে—প্রকাশ্যে নগ্ন হওয়ার অধিকার নিয়ে।

কিন্তু বাংলার সিন কেমন? ওরেব্বাবা। অ্যাকাডেমির গ্যালারিতে সার সার নগ্ন নারীদেহের পেন্টিং দেখে যে কোনো ভিনদেশী এ প্রদেশকে ভাবতেই পারেন শরীর উদ্‌যাপনের মুক্তাঞ্চল। কিন্তু হুঁ হুঁ বাওয়া, এই আমরাই একদিন সমরেশ বসুকে আদালতে টেনে নিয়ে গেছি। এখনও, কিউ-এর 'গাণ্ডু' দেখে বা কিছু কর্তিত অংশ দেখে পুরো ছবি নিয়ে কমেন্ট করে দিয়েছি—''ওটা তো পানু বানিয়েচে।'' রবীন্দ্রনাথও তাহলে 'পানু' লিখেছেন নিশ্চয়ই—স্তন কবিতায়? বস্তুত, যদি তর্কের খাতিরে ধরেও নিই, যে ওগুলো পর্ণোগ্রাফিই, তাতে নাক কোঁচকানোর কী আছে? যেন পর্নোর কখনো কাউকে আনন্দ দেয়নি, কারো কামনা-ফ্যান্টাসিকে দেয়নি নিঃশর্ত প্রশ্রয়। যাক্‌গে সে অন্য বিতর্ক। বাংলারয় নগ্নতাকে প্রায়ই গুলিয়ে ফেলা হয় যৌনতার সাথে। Non-sexyal Nudity বলে কিছুই অভিধানে নেই। সাহিত্য, পেন্টিং, ভাস্কর্য বাদ দিয়ে যেখানেই নগ্নতা বা যৌনতা এসেছে, নাটকে সিনেমায় গানে বা পার্কে—ছ্যা ছ্যা ছি ছি ছো ছো ও অন্যান্য। সকুরভের ছবিতে লেনিনকে নগ্ন দেখানোয় বাম সরকার কাঁচি করে সে ছবিকে (পরে অবশ্য . . .)। মুখ্যমন্ত্রী বলেন (ধর্ষণকে জাস্টিফাই করতে চেয়ে না কী করতে সেটা জানিনা), ''আজকাল তো

দোকানে অ্যান্ড্রু মার্টিনেজ

সবটাই ওপেন।” পাব্‌লিকও মুক্তমনা ও সংস্কৃ তিবাজ—উনিশে এপ্রিলের ডিরেক্টর চিত্রাঙ্গদা বানালে তার সত্যজিৎসূরি তকমা ছিনিয়ে, হোমো বলে হো হো করে, তার চলন বলন নকল করে সস্তার হাততালি কুড়োয় বৈঠকী আড্ডায়। এ শহরের কিছু পার্কে কয়েক বছর আগে ছাতা নিয়ে ঢোকা বারণ ছিল, যুগলরা ছাতাড়ালে চুমু খায় বলে। সুবিধে এ তল্লাটে রাষ্ট্রকে বিরক্ত করতে নগ্ন হতে হবে না, বরোশো যুগল প্রকাশ্য রাজপথে ঠোঁটে ঠোঁট রাখলেই এনাফ।

প্রশ্ন উঠতে পারে, এত কথা বলছে যে লেখক, সে কী আগামীকাল নগ্ন হয়ে রাস্তায় বেরোবে? উত্তরটা প্রাথমিকভাবে ‘না’। ‘না’, কারণ কলেজ থেকে বের করে দিলে, যতই মিডিয়ায় হইচই ফেলি না কেন, কেউ চাকরি দেবে না, খাবার জুটবে না। অবশেষে মার্টিনেজের মতো সুইসাইড। স্বপ্ন যাই বলুক, র‍্যাশনালিটি অন্য কথা বলে। তাই শয়তানকে হারাতে কিছুদিন তার ছকেই এক্কা-দোক্কা খেলতে হয়। কলাম লিখে, নাটক করে। প্রস্তুতি ছাড়া তো আর . . .

কী জানেন, গণতন্ত্রের সংজ্ঞার সবচাইতে চালু ও দুঃখজনক অপভ্রংশ—‘অধিকাংশের মতোই সঠিক মত’। সঠিক হোক বা বেঠিক, অন্ততঃ মানতে আপনাকে হবেই। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় ওই সংখ্যাধিক্যের তেমন দাম থাকে না। কোপার্নিকাস, গ্যালিলিও, মার্কস, ডারউইন, ফ্রয়েড, ফুকো, জর্জ বাঁত, ডি.এইচ. লরেন্স, নবোকভ আরো অগুণতি মানুষকে ফালাফালা করা হয়েছে অন্য কথা, নতুন কথা বলার জন্য, তাতে এঁদের কোন ক্ষতি হয়েছে? যুক্তির জোরে একদিন স্বীকৃতি পেয়েছেন সবাই। স্তালিনপন্থীর সংখ্যা বেশি হলেই ট্রটস্কাইটদের লবিবাজ বলা যায় না। সবাই জামাকাপড় পরলেই স্বেচ্ছা-নগ্নদের গ্রেফতার করা যায় না। করলে, প্রস্তুত থাকবেন, এক আপাত অলৌকিক ভোরে আপনাকে গ্রেফতার করা হতে পারে নগ্ন না হওয়ার জন্যে। উপরোক্তদের সঙ্গ একদিন এক আসনে বসানো হবে Andrew Martinez কিংবা আলিয়াকে, মানা হবে জিনিয়াস—এ আমার দৃঢ় বিশ্বাস। ■

ODDJOINT # বাংলাব্ল্যাক

Bangla Kounterkulture Archive | curation Q | Surojit | Sucheta volunteers Suman | Avishek

জ্যৈষ্ঠ ১৪২২ ● মে ২০১৫

৭. নষ্ট আত্মার টেলিভিসন   মলয়-সুরজিৎ কথাবার্তা

১৯৬৩ সালে মলয় রায়চৌধুরি-র সঙ্গে তাঁর আলাপ পাটনায়। চোখে ম্যানেড্রেক্সের নেশা। চারমিনারে গাঁজা। পাইপে চরস। তার ফাঁকে তাড়ি। সর্বদা নেশাগ্রস্ত । বেশ কিছুদিন কাটে তাঁর মলয়ের সঙ্গে। সম্প্রতি ৭৬ বছরের মুম্বই-প্রবাসী মলয়ের সঙ্গে কথা হয় ফালগুনীর বইটি নিয়ে। তারই কিছু অংশ এখানে রাখা হল। সুরজিৎ সেন

প্রথম সংস্করণের প্রচ্ছদ (ফটোকপি)

একটি কবিতার বই প্রকাশিত হবার ৪১ বছর পরও বাংলা কবিতার প্রাপ্তমনস্ক পাঠকের কাছে প্রাসঙ্গিক রয়ে গেল কী করে?

কোনও পাঠবস্তু যে একটি বিশেষ সময়ে পাঠকের প্রিয় হয়ে ওঠে তার কারণ হল রচনাটি সময়-পরিসরের বীক্ষাকে আত্তীকরণ করে ফেলতে পারে। ফালগুনী উত্তর-ঔপনিবেশিক দুই বঙ্গের বাঙালির সময়বীক্ষাকে তাঁর পাঠবস্তুতে আয়ত্ব করে ফেলেছিলেন। যেমন জীবনানন্দকে সমসাময়িম বিদ্বজ্জনেরা প্রায় সবাই নাকচ করে দিয়েছিলেন; তবু তিনি তাঁর সমসাময়িক কবিদের পাশ কাটিয়ে চাগিয়ে উঠলেন, সময়বীক্ষার কারণে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, একদা অত্যন্ত জনপ্রিয়, কেউ আর বিশেষ পড়েন না, কেননা রাবিন্দ্রীক কবিতার সেই মনন-পরিসরটি অবসৃত; অথচ তাঁর গানের সুর যে-শ্রোতারা শোনেন তাঁদের মুখের দিকে তাকালে বোঝা যায় যে তাঁরা জীবনানন্দের এবং ফালগুনীর সময়বীক্ষার আচ্ছন্নতায় প্রবলভাবে আক্রান্ত। কৃত্তিবাস ওঝার 'রামায়ণ' সারদায় সর্বস্বান্ত হওয়া চাষি-বউও পড়েন না; কিন্তু ঔপনিবেশিক সময়-পরিসরে তার নিয়মিত পাঠ কত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। সিনেমা দিয়ে বোঝাতে হলে বলতে হয় যে, একই কারণে প্রেমিক রাজেশ খান্নার জায়গায় উদয় হলেন ক্রুদ্ধ অ্যান্টি-হিরো অমিতাভ বচ্চন। ফালগুনীর বইটির ক্রেতা ও পাঠকরা কিন্তু বিদ্যায়তনের ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিভূরা নন, তাঁরা দুই বাংলার যুবক-যুবতী। তাঁর বইটি বার বার ছেপে চলেছেন লিটল ম্যাগাজিন সম্পাদক-প্রকাশকরা। অমন জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও, তাঁর জীবদ্দশায় এবং তাঁর মৃত্যুর পরও যে সংকলনগুলো প্রকাশিত হয়েছে, সম্পাদকরা কিন্তু তাঁর কবিতা সেগুলোয় অন্তর্ভুক্ত করেননি। তাঁর জনপ্রিয়তার আঁচ পাওয়া যায় যখন আমরা চট্টগ্রামের নুর হোসেইনের এবং জার্মানির মুজিব রেজওয়ানের কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি ইউটিউবে শুনি। আরও একটি কারণ হল, শ্রুতি আর তার পরের আন্দোলনগুলোর পরীক্ষা নিরীক্ষা সজ্ঞাত বাক্যবিন্যাস ও শৈলী-জটিলতার প্যাঁচ ও কৌশল তাঁর কবিতায় নেই, যে কারণে প্রায় সকলের কাছেই তিনি সহজগম্য।

১৯৭২ সালে প্রকাশিত শক্তির বই 'প্রভু, নষ্ট হয়ে যাই' আর ১৯৭৩ সালে প্রকাশিত ফালগুনীর বই 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন'—এই দুই নষ্টর মধ্যে ফারাক কী?

শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের নিরুপমের আখ্যান 'হৃদয়পুর' আর 'অবনী বাড়ি আছো' মন দিয়ে পড়লে এর উত্তর তুমি পাবে সুরজিৎ। শক্তির নষ্ট হয়ে যাওয়া তসলিমা নাসরিনের আদলে ব্যক্তি-এককের রক্তমাংসের ভোগ-দুর্ভোগের প্রচ্ছায়ায় গড়া। 'কুয়োতলা' আখ্যানের ইনোসেন্ট শক্তি ক্রমে নিজেকে নিয়ে গেছেন স্বনির্মিত পারগেটরির গোলোকধাঁধায়; যেন আর কেউ নষ্ট নয়, তিনি একাই নষ্ট, যদিও কৃত্তিবাসের টেফলন কবিদের মধ্যে তিনি সেই অর্থে নষ্ট ছিলেন না। এখানে বলা দরকার যে, 'হৃদয়পুর' উপন্যাসটিতে হাংরি

আন্দোলনের নিরুপমকে পাওয়া যায়। বরানগরের বিখ্যাত জমিদারবাড়ির ছেলে ফালগুনী কারও কাছে হাঁটু গেড়ে বলছেন না যে, তিনি নষ্ট হয়ে চলেছেন। তিনি বলেছেন 'নষ্ট আত্মার টেলিভিসন'-এর কথা, বাঙালির যে নষ্ট সময় পরিসরকে তিনি তাঁর ব্যক্তি-প্রতিস্বের চারপাশে আবর্তিত হতে দেখছেন, আত্তীকরণ করেছেন বাক্যের পর বাক্যে, তা-ই তিনি অবিরাম দেখিয়ে চলেছেন তাঁর পাঠ্যবস্তুর টেলিভিশনের পর্দায়, এবং তা সহজগম্য ভাষাকাঠামো প্রয়োগ করে। পাঠক নিজেকে ওই পর্দায় দেখতে পান। 'আত্মা' আর 'টেলিভিসন' শব্দ দুটোকে এড়িয়ে গেলে ফালগুনীর মনন-পরিসরকে পাঠক হারিয়ে ফেলবেন। আর বছর তিনেকের মধ্যে বাঙালির পরিবারের টেলিভিশন ঢুকবে, আর তা যে ক্রমে দানবের আকার নেবে, ফালগুনী আঁচ করে ফেলেছিলেন বলে মনে হয়, প্রায় প্রফেটিক ছিল তাঁর দিব্যদৃষ্টি।

উৎপলকুমার বসু বলেছেন, 'ফালগুনী যে দিন আমার হাতে তার বইটি গোপনে গুঁজে দেয় সেই দিনই শেষ হল আধুনিকতার যুগ'—একথা শুনে আপনার কী মনে হয়?

উৎপল একই সঙ্গে আধুনিকতাবাদের বিদায়ের কথাও বলেছিলেন, যখন তিনি বললেন যে, আধুনিকতাবাদী স্থাপত্যের 'ফাংশনাল' নজির হিসাবে বিখ্যাত আমেরিকার 'মেশিন ফর লিভিং' নামে বস্তিবাসীদের জন্য তৈরি সেইন্ট লুইসের বহুতল বাড়িকে নাগরিকরা বিস্ফোরণের দ্বারা ধুলোয় মিশিয়ে দেন, প্রায় ওই একই সময়ে যখন ফালগুনীর গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ফাংশনাল স্থাপত্যের বাড়িগুলো দেশলাইয়ের বাক্সের মতো তৈরি করা হচ্ছিল, বাসিন্দারা ডিপ্রেশানে ভোগা আরম্ভ করেছিলেন, অসুস্থ হয়ে পড়ছিলেন, পারস্পরিক সৌহার্দ্য বিষাক্ত হচ্ছিল। আমাদের দেশে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় অমন বহু নেহেরুভিয়ান কলোনি গড়ে উঠেছিল একঘেয়ে। ফালগুনীও তাঁর কাব্যগ্রন্থটির মাধ্যমে বাংলা কবিতার আধুনিকতাবাদী 'ফাংশনালিজম'কে ধ্বসিয়ে দেবার প্রয়াস করেছেন। আধুনিকতাবাদী কবিতা থেকে বেরিয়ে যাবার বৈশিষ্ট্যগুলো তাঁর কবিতাতে খুঁজে পাই আমরা, যেমন বিষয়কেন্দ্রহীনতা, কেন্দ্রনিরপেক্ষ শিরোনাম, মুক্ত সূচনা ও মুক্ত সমাপ্তি, অভেদের সন্ধান, আবেগ ও যুক্তির দ্বৈরাজ্য, ভিতর-বাহিরের পার্থক্য লোপ, প্রতীকভাঙন, পংক্তির ইনটারলকিং ইত্যাদি। তিনি আধুনিকতাবাদের বিদ্যায়তনিক অনুশাসনের তোয়াক্কা করেননি, প্রতিহত করেছেন আজীবনের উপেক্ষা। অবশ্য তাঁর কবিজীবন ছিল সংক্ষিপ্ত, ৭ জুন ১৯৪৫ থেকে ৩১ মে ১৯৮১, অর্থাৎ বেঁচে থাকলে হয়তো তাঁর পাঠবস্তুতে বাঁকবদল ঘটত। ■

৮. নষ্ট আত্মার টেলিভিসন ফালগুনী রায়

এইখানে

এইখানে সমুদ্র ঢুকে যায় নদীতে নক্ষত্র মেশে রৌদ্রে
এইখানে ট্রামের ঘন্টীতে বাজে চলা ও থামার নির্দেশ
এইখানে দাঁড়িয়ে চার্মিনার ঠোঁটে আমি রক্তের হিম ও উষ্ণতা
ছুঁয়ে উঠে আসা কবিতার রহস্যময় পদধ্বনি শুনি—শুনি
কবিতার পাশে আত্মার খিস্তি ও চীৎকার এইখানে
অস্পষ্ট কু-আশার চাঁদ এইখানে ঝরে পড়ে গনিকার ঋতুস্রাবে

এইখানে ৩২৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের কোন গ্রীকবীর রমন বা ধর্ষণের
সাধ ভুলে ইতিহাসে গেঁথে দ্যায় শৌর্য ও বীর্য এইখানে
বিষ্ণুপ্রিয়ার শরীরের নরম স্বাদ ভুলে একটি মানবী থেকে
মানবজাতির দিকে
চলে যায় চৈতন্যের ঊর্ধ্ববাহু প্রেম—সর্বোপরি
ইতিহাস ধর্মচেতনার ওপর জেগে থাকে মানুষের উত্থিত
পুরুষাঙ্গ এইখানে

এইখানে কবর থেকে উঠে আসা অতৃপ্ত প্রেমিকের কামগন্ধ
কয়েকলক্ষ উপহাসের মুখোমুখি বেড়ে ওঠে আমার উচ্চাশা এইখানে
প্রকৃত প্রশ্নিল চোখে চোখ পড়লে কুঁকড়ে যায় আমার হৃদপিণ্ড
এইখানে
এইখানে সশ্রদ্ধ দৃষ্টির আড়ালে যাবার জন্য পা বাড়াতে হয়

আমি নারী মুখ দ্যাখার ইচ্ছায় মাইলের পর মাইল হেঁটে দেখি
শুধু মাগীদের ভিড়
সাতাশ বছর—একা একা সাতাশ বছর বেক্তিগত বিছানায় শুয়ে
দেখি
মেধাহীন ভবিষ্যৎ জরাগ্রস্ত স্নায়ুমণ্ডলীর পাশে কবিদের কবির কবিতা
চারিধারে ঢিবি দেওয়ালের নীরেট নিঃশব্দ অন্ধকার।

ছবি: সমরণ দাস

ফ্রেশ ইনফরমেশন

ভাদ্রের রৌদ্র আমায় কুকুরের কামোত্তেজনা জানানোর বদলে জানাল শরৎ এসে গ্যাছে—আমি নক্ষত্র ও নৌকার নিহিত সম্পর্কের কথা জানলুম নদির নিকটবর্তী জেলেদের কাছ থেকে—মেরিন ইঞ্জিনিয়ার পাশ করা আমার এক বন্ধু কম্পাসের সাহায্যে সমুদ্রের দিক নির্ণয়ের কথা জানিয়েছিল আমি মরে গেলে আমার চারধারে আর চারদিকে থাকবে কি?

ভাদ্রের রৌদ্রে শরতের আভাষ তখন পাবে অন্য কেউ যেরকম আমার বাবা যে কাঁচামিঠে গাছের আম খেয়েছিলেন তিনি মারা যাবার পর আমি সেই কাঁচামিঠে গাছের আম খাচ্ছি—এ ভাবেই আমি মরে যাবো কাঁচামিঠে গাছের আম তখন খাবে আমার উত্তর পুরুষ অর্থাৎ আইনষ্টাইন ও রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত কথোপকথনের মতন ব্যাপারটা অর্থাৎ মানুষ না থাকলে সুন্দর অ্যাপেলো মূর্তির সৌন্দর্যের কোনো তাৎপর্য থাকবে না কিন্তু মানুষ না থাকলেও পৃথিবী সূর্য ব্রহ্মাণ্ড থেকে যাবে ঠিকঠাক

মানে আমি বলতে চাইছি মানুষ না থাকলে আমটী কাঁচা অবস্থাতেও মিঠে থাকবে কিন্তু সেটা বলার কেউ থাকবে না—সুতরাং সূর্যকে সূর্য মোমবাতিকে মোমবাতি মানুষই বলেছে—মানুষই বলেছে নরের পূর্বপুরুষ বানর বা নরগণ ঘোষণা করেছে এরূপ বিদ্যা ফোনেটীকস অইরূপ বিদ্যা ফিললজি সেইরূপ অসুখ ফাইলেরিয়া এইরূপ প্রত্যংগ ফ্যালাস ইত্যাদি ইত্যাদি

এমতঅবস্থায় আপন কণ্ঠস্বর খুঁজতে গিয়ে যদি কোনো কবি খাবি খায় তবে আমরা আর কিইবা করতে পারি—আমার প্রপিতামহ যাকে বলেছিলেন জল আমিও তাকে বলছি জল—আমার প্রপিতামহ যাকে বলেছিলেন আগুন আমিও তাকে বলছি আগুন—মানে বাবারা যা বলে গ্যাছেন ছেলেরাও তাই বলছে নাতিরাও তাই বলবে অর্থাৎ বস্তুর বস্তুগত নামটি একই থাকবে কেবল পাল্টাবে তার ধারনা যেমন আদিকালে পুরুষাঙ্গকে প্রজনন প্রত্যংগ হিসেবেই দ্যাখ্যা হত—বর্তমানে পুরুষাঙ্গ-কে টেলিপ্যাথিক কম্যুনিকেশনের রাডার হিসেবেও দ্যাখ্যা হচ্ছে—অনেকেই আপেল-কে গাছ থেকে পড়তে দ্যাখে কিন্তু নিউটল কেবল আপেলের পড়াটাই দ্যাখেননি দেখেছিলেন তার সঙ্গে মাধ্যাকর্ষণ—ভাস্করাচার্য অবশ্য ল অফ গ্রাভিটেশন-কে অন্যভাবে আবিষ্কার করেছিলেন এবং কোপার্নিকাসের অনেক আগেই আর্যভট্ট আবিষ্কার করেছিলেন পৃথিবীর সূর্যকেন্দ্রিক আবর্তন—এইসব ঘটনার দ্বারাই প্রমানিত হয় একই সত্য-কে বিভিন্ন আবিষ্কারক ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতিতে মত আবিষ্কার করেন অনেকটা রামকৃষ্ণের বিখ্যাত উক্তির মত যত মত তত পথ নিয়ে মানুষ—মানুষের ঐক্যের ভেতর এ ভাবেই বৈচিত্র্য ও বৈচিত্র্যের ভেতর ঐক্য খেলা করে—শুধু জ্ঞানান্ধ সমালোচকরা সত্যের গুহায় বসে বলে দ্যান—

অমুক তমুকের চর্বিতচর্বন ছাড়া কিছু নয়—হায় হায়—বিদ্যাসাগর অ আ ক খ শিখেছিলেন অন্যের কাছ থেকে তারপর নিজেই প্রণয়ন করেন বর্ণপরিচয়—হে মহান সমালোচকগণ জানান আমায় বিদ্যাসাগর কার চর্বিতচর্বন ছিলেন—জানান—জানান—ভাদ্রের রৌদ্র আমায় কুকুরের কামোত্তেজনার খবর জানাবার বদলে জানিয়েছে শরৎ এসে গ্যাছে—আপনিও অইরকম কিছু ফ্রেশ ইনফরমেশন দিন—নাকি মাও কোট পরে আপনি কোট করবেন টাওইষ্ট মতবাদ—গলায় ক্রুশ ঝুলিয়ে আপনি একহাতে রামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ অন্যহাতে হ্যাভলক এলিস রেখে বলে উঠবেন—লেনিন বলেছেন না-সন্ন্যাসী না-ডনজুয়ান এর মাঝামাঝি জায়গায় আমাদের থেকে যেতে

কোনটা স্যার?

কৃত্রিম সাপ

গাঁজা খেলে আমার খুব দাবা খেলতে ইচ্ছে করে—ইচ্ছে করে
গ্রামার পড়তে আমি হতে চাই না ফিশার বা ফাউলার
দাবা খেললে আমার খুব গাঁজা খেতে ইচ্ছে করে—ব্যাকরণ
পড়ার সময় আমার চাই গাঁজা—আমি পানিনি হতে কোনোদিন
 চাইনি
আমি জানি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার আমার চেয়ে তিনহাজার গুন
 শিক্ষিত
আমি জানি মহানায়ক উত্তমকুমার আমার চেয়ে দুহাজার গুন
 রূপবান
কিন্তু এর ফলে আমার ভেতর কোনো হীনমন্যতার সৃষ্টি হয়নি

জ্ঞানীগুণীরূপবানবিত্তবান মানুষমানুষীর মিছিলে
মূর্খকুৎসিতদরিদ্র মানুষমানুষীর মিছিলে
আমি ভেসে চলে ভুলে যাই সে সময়ে আমি বেটাছেলে না মেয়েছেলে
কিন্তু নিজের প্যান্টের বোতাম বা বুকপকেটে হাত দিলে
অর্ধনারীশ্বর চেতনা থেকে পরুষ অনুভূতির কাছে ফিরে আসি
ফিরে এসে লক্ষ করি অনেক বাড়ির বৌ ও ঝিদের বুক কোমরের
　　পাছার একই মাপ
লক্ষ করি কলকাতার কোনো এক পোষাকের দোকানের শোকেসে
　　রয়েছে সাজানো একটি কৃত্রিম সাপ
এবং ব্যাপারটা অরো ইন্টারেস্টিং এই কারনে যে দোকানটার
　　নাম অ্যারেস্টোক্র্যাট

ক্রিয়াপদের কাছে ফিরে আসছি

আমি নেশাগ্রস্ত তাই সংসারী বন্ধুরা দূরত্ব বজায় রাখে ঠিক
ট্রামে ট্রেনে বাসে ফুটপাথে—আমি আন্দাজ মেপে কথা বলতে
পারিনা কিছুতেই একজন ঘরের বউ দেখলুম বহুগামিতায়
　　বেশ্যাদের ছাড়িয়ে গেল
পয়সা ছাড়াই—আমার হাহাকার ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিলুম অট্টহাসি

প্রেমিকার চোখে চোখ রাখতে গিয়ে দৃষ্টি ফেটে একশো বিষাক্ত সাপ
চলে গ্যালো তার দিকে—আমি পুরোহিতের মন্ত্রপূত টিকিতে
গোমাংস ঝুলিয়ে পরীক্ষা করতে চেয়েছিলুম ধর্মসংস্কারের সহ্যক্ষমতা

শুক্র শনি রবি বাদে রোজ ঠিক সাড়ে বারোটার রোদ্দুরে
আমি রবীন্দ্রনাথের গান শুনতে চেষ্টা করি পানের দোকানে
আমি সোনার তরীর সব ধান লুট করে বিলিয়ে দেবো
　　শান্তিনিকেতনের ভিখিরীদের ভেতর
তারপর খালি নৌকায় চেপে গান গাইবো বাইশে শ্রাবণের
জল ভর্তি কর্পোরেশনের কলকাতায়—কে যাবি পারে ওগো
　　তোরা কে

আমি খ্রীষ্টমূর্তির গায়ে লটকে দিয়েছি কৃত্রিম সাপ
আমি বাবামার ভালোবাসার আড়ালে যৌন বনিয়াদ
আমি ক্রিয়াপদ পরিহার করতে চেয়েও ফিরে আসছি
ক্রিয়াপদের কাছে— ■

৯. লেখকের এলেম নবারুণ ভট্টাচার্য

সব জায়গায় খুঁটিয়ে দেখা না গেলেও লেখকের এলেম এমন এক বস্তু যে সে সচেতন অচেতনভাবে তার যে পরিপার্শ্বের মণ্ডল তার ত্রিকাল, তার সব জটিলতা, সব গোপন টেকটোনিক সঞ্চার ও সংঘর্ষ, সব সম্পর্কের বিচ্ছিন্নতার বিষাদ ও হাহাকার ও অন্বয়ের হর্ষ ও আরাম বিরাট ডানা দিয়ে সপাটে আত্মসাৎ করে ফেলে। ক্ষমতার তারতম্য অনুযায়ী কেউ বেশি পারে, কেউ কম। আর যাদের এলেম ছিটেফোঁটা তারা ঢেউয়ের বদলে ফেনার বুদবুদ দেখতে দেখতে জীবন কাটিয়ে দেয়। সেখানে না দেখা যায় বহুমাত্রিক বর্ণালী ও বহুস্তরের টানাপোড়েন। পাঠকের আত্মিক আয়তনে কোনো হেরফের হয় না। এসব কিছুকে ছাপিয়ে আবার কোনো কোনো লেখক মহাকাশের ব্যাপ্তির আওতায় সবকিছু দেখতে পান, অনিত্যের তাণ্ডবের মধ্যে নিত্যের অভিমুখিনতার ট্র্যাজেডি বা কমেডি—সবটাই ধরে ফেলা হয় এক মহাজাগতিক জালে। লেখকের সিদ্ধি এক অক্লান্ত প্রতিভার পরিচায়ক। এ এক দার্শনিক হলোগ্রাম যার মধ্যে সংখ্যাহীন সম্পূর্ণতা রয়েছে। বশীর বা মান্টো, বুকলগাকভ বা গ্রসম্যান, টমাস মান বা গার্সিয়া মার্কেজ এই কাজগুলোই করেছেন। এঁদের ক্লোনের সংখ্যাও কম নয়। যদিও তারা সচরাচর স্বল্পায়ুই হয়। আর বড়ো লেখক তো আবার চাইলেই পাওয়া যায় না। পয়সা ফেললে টাইটান পাওয়া যাবে না, বড়ো জোর টাইটানিক কয়েকটা বানানো যেতে পারে যাদের বরাতে ভরাডুবি বাদে আর কিছুই থাকতে পারে না। লেখার খামতি ভাটবচনে ঢাকার চেষ্টা অহরহ চলেছে। এবং কিছু পাঠক ও আলোচক বিভ্রান্তির টোপও গিলে ফেলে, পরিণামে জাল আইকনরা ফুলেফেঁপে ওঠে। ■

লেখকের সিদ্ধি এক অক্লান্ত প্রতিভার পরিচায়ক। এ এক দার্শনিক হলোগ্রাম যার মধ্যে সংখ্যাহীন সম্পূর্ণতা রয়েছে। বশীর বা মান্টো, বুকলগাকভ বা গ্রসম্যান, টমাস মান বা গার্সিয়া মার্কেজ এই কাজগুলোই করেছেন।

১০. গাঁজা বাসুদেব দাশগুপ্ত

ছবি: সম্বরণ দাস

কিছুদিন ধরেই আমি লক্ষ করছি কলকাতার তরুণ লেখক ও ছাত্র-মহলে দেশি সরাপ পানের অভ্যাস ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে-এ আমার গভীর পরিতাপের বিষয়। যে সব তরুণদের মধ্যে এই মদ্য পানের নেশা ক্রমাগত গাঢ় হয়ে উঠেছে তারা একবারো ভেবে দেখেন না ওই মদ্যে যে পরিমাণ অর্থব্যয় হয় তা দিয়ে অনায়াসে একটা ভালো রেডিও এবং রেকর্ড প্লেয়ার হয়ে যায় (এই মুহূর্তে এর চেয়ে দামি আর কিছু আমার মনে হচ্ছে না)। তাছাড়া গত কয়েক মাসের মধ্যে একের পর এক দুর্ঘটনার খবর আপনারা দেখেছেন নিশ্চয়। কাগজের পাতায় চোলাই মদ
খেয়ে মৃত্যু কী বীভৎস করুণ ভাঙাচোরা বিবৃত অই মুখচ্ছবি, মৃত মানুষের অইসব ফটো দেখে আমার—শুধু আমার নয়, আরো অনেকের বুক হিম হয়ে গিয়েছিল ঠিক। এরপরেও আছে দেশি মদের সরবরাহ খর্ব, মাল না থাকায় সন্ধে ৭টার মধ্যে দোকান বন্ধ, বেআইনি ডেনগুলোতে ধরনা, ডবল পয়সা বেরিয়ে যায় গলা ভেজে না এবং ভয়ে ভয়ে দেখে নিতে হয় ছিপিছাপ ইত্যাদি। শেষ পর্যন্ত সেই রামলালও বলে মাল পাওয়া যাচ্ছে না বাপু। তখন দিশেহারা, বিহ্বল, ক্ষিপ্তপ্রায় কজন বিলিতি, বারে গিয়ে করুণ মুখে রাম টানা হয় কয়েক পেগ আর অপর দিকে মোটাসোটা ফরসা পেলব চেহারার এক ভদ্রলোক অত্যন্ত নির্লিপ্ত ভাবে ইংরেজি খবরের কাগজসহ শরবত খাবার মতন হুইস্কির গ্লাসে চুমুক দেন আলতো করে। (চুকচুক)
দেখে ঘাবড়ে গিয়ে সকলেই পরস্পর বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে ফিসফিস বলে, খাওয়া শেষে আড়ে আড়ে চায় এদিক ওদিক অ্যাকেবারে রাস্তায় নেমে হাত পা ছুঁড়ে স্বাধীন, চিৎকার ছাড়ে—গাড়ি বোলাও।
যদি এ জাতীয় নেশা কিছু করতেই হয় তাহলে গাঁজা থাকতেও কেন এই হেনস্তা?
মদ খাবেন না, গাঁজা খান। কারণ
(১) যেখানে মদে ব্যয় হয় পাঁচ টাকা সেখানে গাঁজার খরচ হবে মাত্র চার আনা। ইচ্ছে হলে দু'টাকা দিয়ে দোকান থেকে এক কিলো দুধ কিনে খেয়ে নিন, দেখবেন শরীরের জেল্লা দু'দিনে ফিরে গেছে।
(২) পেটে গ্যাস এবং পাতলা পায়খানা মদ স্পর্শ করা উচিত নয়। বিষবৎ পরিত্যাজ্য, কিন্তু গাঁজা কোষ্ঠকাঠিন্যে কি কোষ্ঠ তারল্যে একই প্রকার ফলপ্রদ ও হিতকর।

(৩) অধিকাংশ গাঁজার আড্ডাতেই সমস্ত দিনরাত পুরিয়া বেচা কেনা চলে, দোকান বন্ধ হবার ভয় নেই অন্তত শ্মশান ঘাটে অবারিত দ্বার। অথচ আজকাল মদের সরবরাহ যেভাবে কমে যাচ্ছে তাতে টাইম মতো মাল পাওয়াই কঠিন। গোপন জায়গাগুলোতেই বেশি ভয়, কী জানি কী খাচ্ছি!
(৪) মদ খেলে মানুষের মনে হিংসা, ক্রোধ, লোভ, লালসা...প্রভৃতি ক্রমাগত বৃদ্ধি পায়, আর গাঁজা দেয় স্নেহ, উদারতা, মমতা...সর্বজীবে ভালোবাসা। গাঁজা খেয়ে কেউ কোনোদিন মারামারি বা ঝগড়াঝাঁটি করছে শুনেছেন কি? গাঁজার আড্ডা থেকে শুরু হয়েছে কোনো সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা?
(৫) গাঁজা মানুষকে করে আত্মসুখী, মদ বহির্মুখী।
(৬) মদ খেয়ে মানুষ হয় চঞ্চল ও বিলাসি আর গাঁজায় আনে স্থৈর্য, গভীরতা ও বৈরাগ্য। জনগণকে গাঁজার নেশা ধরিয়ে দিলে অনেকদিন আগেই ভিয়েৎনাম সমস্যা মিটে যেত।
(৭) গাঁজায় মুখে গন্ধ হয় না, বাড়ি ফিরে নির্ভয়ে মার কাছে বসে ডালরুটি খেতে পারবেন।
(৮) গাঁজায় সুনিদ্রা হয়। খিদে এবং হজম ক্ষমতা বাড়ায় আর দেয় সহ্যশক্তি, শোকতাপ বিপদ আপদ রোদজল ঝড়বৃষ্টি সব কিছুকেই আপনি উপেক্ষা করতে পারবেন, যদি গাঁজা খান। মদ কেবলই স্পর্শকাতর ও অভিমানী করে তোলে।
(৯) মদে মানুষের মনে জেগে ওঠে ব্যর্থ অতীত, তার স্মৃতি, শোক ও বেদনা আর গাঁজায় দরজা খুলে দেয় অনন্ত ভবিষ্যত, শরীরের কোষ ফেটে বেরিয়ে আসে এক নীল পাখি। ধেয়ে চলে আনন্দে অই দিকে।
(১০) জাগতিক জীবনের যাবতীয় পারম্পর্যহীনতা ধরা পড়ে মদের নেশায়, আর পারম্পর্যহীনতার মধ্যে যে সব গোপন সংকেত সমূহ লুকোনো থাকে তা গ্রাস করে নেবার ক্ষমতা জন্মে ওই গাঁজা থেকেই।
(১১) মদ কখনো কখনো মানুষকে নারীসঙ্গলোলুপ করে তোলে আর গাঁজায় আপনি স্ত্রীসংসর্গ পরিত্যাগ করে হয়ে উঠবেন পুরুষ প্রেমিক যা সহজলভ্য, নিরাপদ এবং পবিত্র।
(১২) মদে যৌনগ্রন্থিগুলো শিথিল হয়ে আসে আর গাঁজায় এগুলো হয়ে ওঠে সবল ও সতেজ। মদ বীর্যস্খালক, গাঁজা বীর্যধারক।
(১৩) গাঁজা সম্পূর্ণরূপে ভারতীয় তথা বাঙালির ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত। বুর্জোয়া শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই সুরা পানের নেশা ভারতবর্ষে প্রবল হয়ে ওঠে। ইংরেজ আগমনের পূর্বে এ দেশে সুরাপান একপ্রকার নিষিদ্ধ ছিল। আমার পরম শ্রদ্ধেয় খাঁটি বাঙালি ঁত্রৈলোক্যনাথ মুখোপাধ্যায় বারংবার গাঁজার মহিমা কীর্তন করে গেছেন এবং সকলকে গাঁজা খাবার নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিলেন। হায়, তাঁর লেখাই বা আজ কে পড়ে আর কেই বা শোনে তাঁর উপদেশ। ■

ক্ষুধার্ত সংকলন-২/১৯৬৮

ছবি: সম্বরণ দাস

বাংলা